নিরীক্ষণ

আগস্ট ২০১৭

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী

২১৪ তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২১৪তম বিশেষ সংখ্যা : আগস্ট ২০১৭

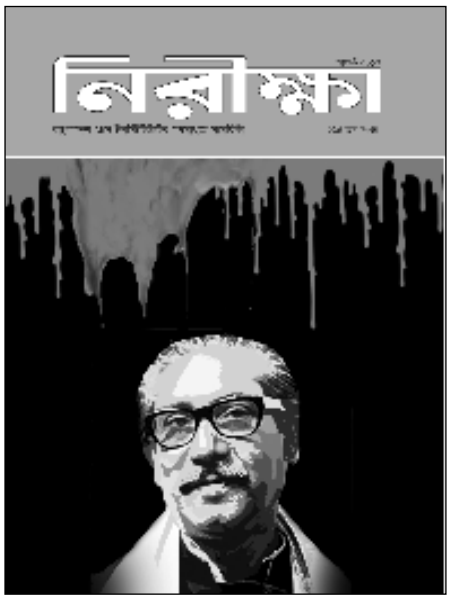

আগস্ট শোকের মাস। বাঙালির কাছে পিতা হারানোর বেদনাজাগানিয়া এ মাস। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এ ঘাতকের নির্মম বুলেটে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিহত হলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব যে আরো বেশি শক্তিশালী হবে, সেটা হয়তো ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু আজ বাঙালির হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আজ বঙ্গবন্ধু স্বীকৃত। বঙ্গবন্ধু আগাগোড়া একজন রাজনীতিবিদ হলেও তিনি ছিলেন সাংবাদিকবান্ধব। সংবাদপত্রে কাজও করেছিলেন তিনি প্রথম জীবনে। তাই বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট সাংবাদিক কমিউনিটিরই একজন হিসেবে ভাবে বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিগত বছরগুলোর মতো এবারও নিরীক্ষা'র এ বিশেষ আয়োজন। এ বিশেষ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের আরো নানান দিক। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে। আর পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ হলেই আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
সুভাষ চন্দ্র রায়
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান

সূচিপত্র

গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু : ১৫ই আগস্টের আগে ও পরে বোরহান বিশ্বাস	৫
যে মানুষ মৃত্যুর জন্য তৈরি তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে না: শেখ মুজিব	৮
বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক জীবন এবং প্রেস কাউন্সিল গঠন শামীমা চৌধুরী	১০
গণমাধ্যম ও বঙ্গবন্ধু মো. আবদুল রকিব খান	১৩
বঙ্গবন্ধু নিজেই যখন লেখক ও সংবাদপত্রের মানুষ শাহ শেখ মজলিশ ফুয়াদ	১৮
বাড়ির নাম বত্রিশ নম্বর মো. কবির হোসেন কাব্য	২৪
স্বাধীনতার জন্য যিনি ৪৬৭৫ দিন কারাগারে দিলেন সোহরাব হাসান	২৭
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান ড. শিল্পী ভদ্র	২৯
বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' মুক্তি সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দলিল দিপংকর গৌতম	৩৫
পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু শাফিকুর রাহী	৪০
বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু অনুপম হায়াৎ	৪৪
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা রীতা ভৌমিক	৪৮
একজন স্বপ্নস্রষ্টা মানুষের সৃষ্টি মুনীরুজ্জামান	৫১
আমার বাবা কর্নেল জামিল কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতীক: আফরোজা জামিল কঙ্কা	৫৩
তাঁর মৃত্যুর পরে রশীদ হায়দার	৫৭
আমার কলমে বঙ্গবন্ধু আমিনুল ইসলাম	৬০
বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক লাভ খালেক বিন জয়েনউদদীন	৬৪
চেতনায় বঙ্গবন্ধু: একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনীক মাহমুদ	৬৬
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএম শফিকুল ইসলাম	৬৮
বঙ্গবন্ধুই বাঙালির রক্ষাকবজ শহীদ ইকবাল	৭০
সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিল মনোয়ারা মনু	৭২
ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শেখ মুজিব ও আজকের বাংলাদেশ জয়শ্রী জামান	৭৪
বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মরণীয় উক্তি	৭৯

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৪তম বিশেষ সংখ্যা
আগস্ট ২০১৭

সূচিপত্র

'৭৫ এর ১৫ই আগস্ট ছিল শুক্রবার। অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর পদার্পণের খবরটি প্রতিটি পত্রিকায় লিড নিউজ হিসেবে ছাপা হয়। প্রতিটি পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশ করে ক্রোড়পত্র। ক্রোড়পত্রটির মাঝখানে ছিল বঙ্গবন্ধুর চশমা পরা ছবি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬

পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুবিরোধী নানা ধরনের খবর ও সম্পাদকীয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান আমলের গোটা সময় সামরিক শাসক, স্বৈরশাসক। ওই সময় অপপ্রচার ও কুৎসাকে মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের প্রধান টার্গেট ছিলেন বঙ্গবন্ধু

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৬

আবদুল হালিম বয়াতিসহ আবদুল লতিফ, রেজাউল করিম চৌধুরী, শাহ আবদুল করিম, শফি বাঙালি, মহিন শাহ, কাঙাল কেবর, আবদুল গণি, মুস্তাফিজুর রহমান, প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া, সাইদুর রহমান বয়াতি প্রমুখ শত শত গীতিকারের গান রয়েছে মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধকে প্রসঙ্গ করে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩৩

বঙ্গবন্ধুর ওইসব রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন আবদুল মান্নান। লাশ দাফন হয়ে যাওয়ার পর সবার অলক্ষে তিনি বাড়ির পেছন দিয়ে, ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে চলে যান নদীর ধারে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫৯

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service @ Doorsteps

গণমাধ্যম সহায়িকা
ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ
প্রেস ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু
১৫ই আগস্টের আগে ও পরে...

বোরহান বিশ্বাস

ভোরের আভায় পাখির কলতানে মুখরিত হওয়ার অপেক্ষায় প্রকৃতি। নতুন দিনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। সর্বত্র সাজ সাজ রব। ছাত্রছাত্রী আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিলে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। মানপত্র প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধু আসলে তা পাঠ করা হবে।

না, সেদিন ভোরের আকাশে সূর্য ওঠেনি। বাংলার মসনদে আবারও মীরজাফরের ক্ষমতাসীন হওয়ার পদধ্বনি। তারই চূড়ান্ত মহড়া দিতে ঢাকা সেনানিবাস থেকে ট্যাঙ্ক এসেছে ৩২ নম্বরে। ঘাতকের বুলেটে স্বদেশের মাটি রক্তাক্ত হয়েছে দেশ রূপকারের রক্তে। ঝরেছে আরও কিছু তাজা প্রাণ। বিষাদের কালো ছায়া ধানমন্ডি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বেতারে ভেসে আসছে, 'আমি মেজর ডালিম বলছি...।' পিনপতন নিস্তব্ধতা চারদিকে। সবার মতো গণমাধ্যমও কি সেদিন নিশ্চুপ ছিল? ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের যে সাহসি ভূমিকা বাঙালি দেখেছিল স্বাধীন দেশে ৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর তা কি একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল! ১৫ আগস্টের আগে ও অব্যবহিত পরে কী ভূমিকা ছিল গণমাধ্যমের?

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। এ বছরই সবচেয়ে বেশি আয়োজন করা হয় পত্রিকাগুলোয়। অধিকাংশ পত্রিকা ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে বিশেষ সংবাদ, উপসম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তবে দৈনিক সংবাদের ৮ মার্চে প্রথম পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য খবর ছাপা হয়েছিল। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ নিয়ে বাকশাল আয়োজিত এক সভার খবরের সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতাদের ছবিও প্রকাশ হয়েছিল। যেখানে জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়াও শ্রোতাদের কাতারে ছিলেন। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল '৭ই মার্চ বাকশাল আয়োজিত সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ' (দৈনিক সংবাদ, ৮ মার্চ, ১৯৭৫)।

'৭৫ এর ১৫ই আগস্ট ছিল শুক্রবার। অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর পদার্পণের খবরটি প্রতিটি পত্রিকায় লিড নিউজ হিসেবে ছাপা হয়। প্রতিটি পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশ করে ক্রোড়পত্র। ক্রোড়পত্রটির মাঝখানে ছিল বঙ্গবন্ধুর চশমা পরা ছবি। ছবির ওপরে জাতির জনক কথাটি লেখা ছিল। যার শিরোনাম ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র'। (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পিআইবি : ২০১৩, ১৫ আগস্ট, পৃষ্ঠা: ১৬৪)।

ওই দিন অর্থাৎ, ১৫ই আগস্ট দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় বাঁ পাশের দুই কলামের প্রধান খবর, 'বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন।' খবরটির সঙ্গে আরেকটি খবর ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণের সাড়া' শিরোনামে। শেষ পাতায় বঙ্গবন্ধুর একটি হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিয়ে ফিচার ছিল 'বঙ্গবন্ধুকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত জানাবে।'

অনেকেই মনে করেন, ১৫ই আগস্টের ঘটনায় ঐদিন দেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এটি ঠিক নয়। ঐ সময় দেশে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, ডেইলি অবজারভার ও দি টাইমস নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল এবং ১৫ আগস্ট যথারীতি প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে কারফিউ, অন্যদিকে পত্রিকা সরবরাহে খুনিদের নিষেধাজ্ঞার কারণে পাঠক পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেনি। তারা জানতে পারেনি ঐদিনের পত্রিকায় কী ছিল। খুনিরা সকালেই চারটি পত্রিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে সরিয়ে ফেলে। প্রেসম্যাটার বিনষ্ট করে ফেলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কিছু সহকর্মী ও সাংবাদিকদের বদৌলতে ঐদিনের কাগজ সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষিত কাগজ থেকেই আমরা জানতে পারি ঐদিনের দৈনিকসমূহে কী কী ছিল। অবৈধ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমল পর্যন্ত এসব জানা যায়নি। (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পিআইবি : ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৬৩)।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর অবৈধ ক্ষমতা দখলের মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে পত্রিকাগুলোর শিরোনামও রাতারাতি পাল্টে যায়। যেমন– বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরদিন ১৬ আগস্ট দৈনিক বাংলার আট কলাম জুড়ে শীর্ষ খবর ছিল 'খন্দকার মোশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি'। যার শোল্ডারে (উপশিরোনামে) ছিল, 'শেখ মুজিব নিহত : সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি : সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ।'

প্রকাশিত ওই খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে ছিল– 'শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর এই ক্ষমতা গ্রহণের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে নিহত হন বলে ঘোষণা করা হয়।'

ওই খবরে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেনের কাছ থেকে খন্দকার মোশতাকের শপথ নেয়ার তথ্য, মোহাম্মদ উল্লাহকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, ১০ মন্ত্রী ও ৬ প্রতিমন্ত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রীরা হলেন- 'বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ফণী মজুমদার, মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, আবদুল মান্নান, মনোরঞ্জন ধর, আব্দুল মোমিন, আসাদুজ্জামান খান'। প্রতিমন্ত্রীরা হলেন- 'শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, কে এম ওবায়দুর রহমান, ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী'। এতে আরও বলা হয়, 'সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার পৃথক পৃথক বেতার ভাষণে মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নয়া সরকারের প্রতি আনুগত্য ও দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন।'

শীর্ষ খবরের বাঁ পাশে ছিল অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কাছে মোশতাকের শপথ নেয়ার ছবি। এর ঠিক নিচে পাঁচ কলামে ছিল 'দুর্নীতির সঙ্গে আপস নেই' শিরোনামে মোশতাকের বেতার ভাষণ।

১৬ আগস্ট ছয় কলামে ইত্তেফাকের মূল শিরোনাম ছিল 'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ'। উপশিরোনামে ছিল 'দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ, সুবিচার ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা'। খবরটির কোথাও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি। শীর্ষ খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গতকাল প্রত্যুষে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনভার গ্রহণকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হইয়াছেন।'

ওইদিন ইত্তেফাকে অন্যান্য খবরের মধ্যে ছিল– জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দায়িত্বভার গ্রহণ, জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস, মোশতাক সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি, নয়া সরকারের জন্য জুমার নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত (চিত্রসহ), যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক কূটনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ, বিদেশি দূতাবাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার আশ্বাস, গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারণ করে বি এ সিদ্দিকীকে রেডক্রসের চেয়ারম্যান নিয়োগ, নির্দেশাবলী, লন্ডন হাইকমিশন ভবনে বিক্ষোভ ও সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলাসহ কয়েকটি খবর।

দ্য বাংলাদেশ টাইমস ১৬ আগস্ট শিরোনাম করে 'MUSHTAQUE ASSUMES PRESIDENCY.' যার উপশিরোনাম ছিল, 'Martial Law proclaimed in the country : Mujib killed.' খবরটির ভেতরের অংশে লেখা হয়, ''The Armed Forces of Bangladesh took over power in the 'greater national interest' under President Khondokar Mushtaque Ahmed, topping the former President Sheikh Mujibur Rahman early on Friday morning , reports BSS.

The former President Sheikh Mujibur Rahman was killed at his residence during the takeover, it was announced.''

অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে ছিল– 'Values have to be rehabilitated,' 'People thank Armed Forces,' 'Special prayers,' 'Mujib picture removed,' 'US ready to normal ties.' 'Pakistan decides to recognise.'

দ্য বাংলাদেশ অবজারভার এর শিরোনাম ছিল– 'Mushtaque becomes President.' খবরটির শোল্ডারে ছিল– 'Armed Forces take over : Martial Law proclaimed : curfew imposed.' এর টিকারে ছিল– 'Mujib killed : Situation remains calm.' অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে ছিল– 'Mushtaque calls for cooperation,' 'Special prayers,' 'Justice must be established : President- Work hard to improve condition quickly.' 'Pakistan accords recognition.'

ওই সময় প্রকাশিত পত্রিকগুলোর ওপর যে সেনাছাউনি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটি উল্লেখিত চারটি পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রায় একই রকম সংবাদ 'বিশেষ মোনাজাত' (Special prayers) অথবা সম্পাদকীয় দেখে অনুমান করা যায়। সম্পাদকীয় সাধারণত ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৬ আগস্ট উল্লেখিত চারটি পত্রিকার তিনটিই একযোগে প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ পাশের দু কলাম জুড়ে (বাংলাদেশ অবজারভার তিন কলামে) বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল- 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ'। ভেতরে লেখা হয়- 'জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক ক্রান্তির সূচনা হয়েছে। জাতীয় জীবনে সূচিত এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছেন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা।' এতে সশস্ত্রবাহিনীর প্রশংসা করে বলা হয়, তারা পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় ছিল 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' নামে। এখানে মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণের ঘটনাকে দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালকে বলা হয়, 'সে সময় দেশবাসী বাস্তবক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় গভীর হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।' বাংলাদেশ টাইমস এর সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল– 'On the threshold of a new era.' ভেতরে লেখা ছিল– 'The valiant armed forces of the country under the leadership of President Khondokar Mushtaque Ahmed taken over the reins of the Government in a smooth and orderly way at a time when a change had become absolutely necessary; but the situation was such that no change could be effected in a constitutional manner.'

বাংলাদেশ অবজারভার এর সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল– 'Historical necessity.'

'৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর কোন ছবি বা সংবাদ প্রকাশ পায়নি সংবাদপত্রে। বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদন খান জানান, ঐ সময়

সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রেস অ্যাডভাইস আসতো। তার মতে, সাংবাদিকদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারী নির্দেশনার (প্রেস অ্যাডভাইস) জন্য তারা বঙ্গবন্ধুর কোন ছবি ও সংবাদ বা তার হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করতে পারেননি। একই ধরণের মত প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক মহাদেব সাহা। তার মতে, সে সময় সাংবাদিক তো দূরের কথা কোন মানুষেরই বাকস্বাধীনতা ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সি থেকে প্রতিদিন নির্দেশ জারি করা হতো। সরকারী নির্দেশনামা, বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে সংবাদপত্রকে পরিণত করা হয়েছিল একরকম প্রেসরিলিজ পত্রে। বিশিষ্ট ফটোসাংবাদিক রশিদ রশিদ তালুকদারও একই ধরণের মন্তব্য করেন। তার মতে, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনিসহ আরো দু'জন ফটোসাংবাদিককে আর্মিরা ৩২ নম্বরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে ছবি তুলতে হয়। তিনি বলেন, 'নিজের ইচ্ছামতো একটি ছবিও আমরা তুলতে পারিনি।' ছবি তোলা শেষে জোর করে তাদের কাছ থেকে এক্সপোজ আনএক্সপোজ করা সকল ফিল্মই আর্মিরা খুলে নেয়। (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পিআইবি : ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৮৫)।

১৭ আগস্ট সব পত্রিকাতেই মোশতাকের জীবনালেখ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সৌদি আরব ও সুদানের স্বীকৃতির সংবাদ প্রকাশিত হয়। জীবনীতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার সম্পর্কের সবিস্তার বর্ণনা ছিল। সাবেক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় দাফন করা হয়। কোন পত্রিকাই এই সংবাদটিকে গুরুত্ব দিয়ে ছাপায়নি।

১৮ আগস্ট তর্কবাগীশ সরকারকে অভিনন্দন জানান। ১৪ আগস্ট ও তার আগের প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র প্রত্যাহার করে সরকার। এদিন দৈনিক বাংলা 'মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা' শিরোনামে মোশতাকের ভাষণকে অবলম্বন করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে মোশতাকের প্রশংসা করে বলা হয় 'বলিষ্ঠ, বিচক্ষণ বৈদেশিক নীতি; দুর্নীতির সঙ্গে আপোস নেই।' ১৮ আগস্ট ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় ছিল, 'সবার প্রতি বন্ধুত্ব'। পরদিন সম্পাদকীয় ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং সৌদি আরবের স্বীকৃতি।'

২০ আগস্ট দৈনিক বাংলার প্রধান প্রতিবেদন ছিল 'নয়া সরকারের সঙ্গে বাদশাহ খালেদের ইসলামী সংহতি প্রকাশ, সৌদি আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'। ওই দিন প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ খন্দকার মোশতাকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাপা হয়। অন্য একটি খবরে বলা হয়, 'দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক'।

২২ আগস্ট মোশতাক সরকার দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ তাদের আগের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের এই ঘোষণাটি ২৩ আগস্ট দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়।

২৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী কোরবান আলী ও আব্দুস সামাদ আজাদসহ ২৬ শীর্ষ মন্ত্রী, সাংসদ ও বাকশাল নেতাকে গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশিত হয়। ভারত, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, সুদানসহ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি বড় করে ছাপা হয়।

২৪ আগস্ট দৈনিক বাংলার প্রধান খবর ছিল, 'সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান জেনারেল জিয়াউর রহমান। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে রদবদলের খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে কে এম সফিউল্লাহর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ভারতে প্রশিক্ষণরত ব্রিগেডিয়ার এইচ এম এরশাদকে মেজর জেনারেল পদমর্যাদায় উন্নীত করে মেজর জিয়ার স্থলে ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর মত যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবরটি এমনভাবে প্রকাশ করেছে যা সেনা সমর্থিত সরকারের পক্ষেই গেছে। যেমন– নিউইয়র্ক টাইমস ১৫ই আগস্টে বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবরটি প্রকাশ করে। কিন্তু তারা অন্য ২০ জনকে হত্যার বিষয়ে সেদিন কোন সংবাদ ছাপেনি। ওয়াশিংটন পোস্টসহ বিশ্বের অন্য বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর সংবাদ পরিবেশনও ছিল এ রকমই।

নিউইয়র্ক টাইমস ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিষয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কোন খবর ছিল না। এর একটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ১ হাজার ৬২ শব্দসংখ্যার ওই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে মুজিব উৎখাত ও নিহত; দীর্ঘদিনের সহযোগী ও মন্ত্রিসভার সদস্য আহমেদ নতুন প্রেসিডেন্ট; মুজিব নিহত, ঢাকা রেডিওর খবর।' এতো বড় একটি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে খবরটিতে কোন ইঙ্গিতই ছিল না।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ভেতরের পাতায়। যার শিরানোম ছিল, 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থানে মুজিব ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার খবর।' এতে বলা হয়, 'সশস্ত্র বাহিনী আজ ভোরে এক অভ্যুত্থান করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে...।'

১৬ আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমস বাংলাদেশ নিয়ে আরো ছয়টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল এমন–'বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থা সংহত করার উদ্যোগ অভ্যুত্থানের নেতাদের; অধিকাংশ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন; অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন ও কার্ফ্যু জারি...।' দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ।' একই পৃষ্ঠায় 'এক নজরে বাংলাদেশ' শিরোনামে অন্য একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলি উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপানো হয় দুটি প্রতিবেদন। একটির শিরোনাম ছিল, 'ঢাকার সরকারের প্রস্তাবের অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র।' অন্যটির শিরোনাম, 'বাঙালিদের মুক্ত করতে মুজিবের নেতৃত্বে দীর্ঘ লড়াই।' ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান' শিরোনামে শিশু রাষ্ট্রটির ট্র্যাজেডি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।

ওয়াশিংটন পোস্ট ১৬ আগস্ট সংখ্যায় ১৫ই আগস্টের ডেটলাইনে লিখে, 'ইসলাম ও পশ্চিমাদের সমর্থক একটি সেনা সমর্থিত সরকার ভোরে এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পর আজ বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।' প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, 'উৎখাতের সময় বামপন্থী রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানের প্রাণ গেছে...।'

১৬ আগস্ট ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এর শিরোনাম ছিল, 'অবশ্যম্ভাবী পতন'।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ এনে দেয় এবং পাকিস্তানে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মুজিব হত্যার তিন ঘন্টার মধ্যেই মুজিবের মৃত্যু ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর করাচি ও লাহোরের পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ বুলেটিন বের করে এবং রেডিও পাকিস্তান সকাল আটটার খবরে তা প্রচার করে। সরকারের পাশাপাশি পাকিস্তানের গণমাধ্যমও বাংলাদেশের পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশ অব্যাহত রাখে। ১৬ আগস্ট উর্দু পত্রিকা 'নওয়া-ই-ওয়াক্ত' দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে মোশতাককে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দেশের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' বা 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' রাখার পরামর্শ দেয়। 'পাকিস্তান টাইমস' এই পরিবর্তনের ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করে। ১৭ আগস্ট রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত এক খবরে বাংলাদেশের নতুন সরকারের 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' নামকরণের প্রশংসা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতি এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বানকে সমর্থন করে। যদিও ২০ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার দেশটির ইসলামিক প্রজাতন্ত্র নামকরণের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করে যে, সরকারের মূলনীতির কোন পরিবর্তন হবে না। সরকারের চার মূলনীতিও অপরিবর্তিত থাকবে বলে প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশে ঐদিনই ঘোষণা করা হয়। (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পিআইবি : ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৬৯)।

বিশিষ্ট সাংবাদিক রাহাত খান তখন দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করেন। তার মতে, এমনিতেই বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী ঘেঁষা লোক হিসাবে চিহ্নিত ছিলাম। চাকরি হারানো ছাড়াও ছিল মৃত্যুভয়। না, ১৫ই আগস্টের ঠিক পরপরই খুনি এবং খুনি সরকারের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ বা ভাষ্য লিখিনি। তবে, ১৯৭৬ সালে সম্ভবত (সালটা ঠিক মেন নেই) 'এ লাশ রাখবো কোথায়' নামে একটি নিবন্ধন সংকলন বেরিয়েছিল, সেই পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। এই সংকলনটি ছিল ১৫ আগস্টের মর্মন্তুদ ঘটনার পর বঙ্গবন্ধুর ওপরে লেখা প্রথম পত্রিকা। কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। ছাত্রলীগ যুবলীগের কিছু সংখ্যক সাহসী লোক গোপনে এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমার কাছ লেখা সংগ্রহ করেছিলেন মিনার মনসুর। তিনি বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত আছেন। (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পিআইবি : ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৯৮)।

'৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর 'বঙ্গবন্ধু' নামটি উচ্চারণ করা যেত না রাষ্ট্রীয় কোন গণমাধ্যমে। সেদিন বাংলার যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে তা আবার সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়। নির্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমাদের গণমাধ্যম এখন বলতে পারে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

লেখক: ভোরের কাগজে কর্মরত

যে মানুষ মৃত্যুর জন্য তৈরি তাঁকে কেউ

হত্যা করতে পারে না – শেখ মুজিব

পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস কারাভোগের পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে তিনি বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেন। মিডিয়া ফ্রেন্ডলি বা গণমাধ্যমবান্ধব শেখ মুজিব দেশে ফিরেও দেশি-বিদেশি অনেক সাংবাদিককে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট। ১৯৭২ সালে ফ্রস্ট কাজ করতেন নিউইয়র্ক ভিত্তিক টিভি চ্যানেল ডব্লিউএনইডব্লিউ টিভি'তে। এই টিভি'তে 'দ্য ডেভিড ফ্রস্ট শো' নামের একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন খ্যাতিমান এই সাংবাদিক। সেই সময়ে শো'টি বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ অনুষ্ঠানে ফ্রস্ট সেই সময়ের আলোচিত কিছু ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার, বিশ্বখ্যাত দাবাড়ু ববি ফিশার, হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী, জর্জ ফোরম্যান, ইরানের শাহ মোহাম্মদ পাহলভিসহ অনেকে।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পরপরই বাংলাদেশে আসেন ফ্রস্ট। নেন বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেয়া সেই সাক্ষাৎকারটি ১৯৭২-এর ১৮ই জানুয়ারি ওই টিভি'তে সম্প্রচারিত হয়। বিস্তারিত সেই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু অনেক অজানা কথা তুলে ধরেন। পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারটির সংকলিত রূপ তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকারটি সংকলন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক **মো. মিনহাজ উদ্দিন**।

ডেভিড ফ্রস্ট : .. যে রাতে (২৫ মার্চ) পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঢাকা আক্রমণ করল তখনতো আপনি বাড়িতেই ছিলেন। আমার মনে হয়, আপনি খবর পেয়েছিলেন যে সৈন্যরা শহরের দিকে রওনা হয়েছে। তাহলে কেন আপনি বাসায় থেকে গ্রেফতার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

শেখ মুজিব : দেখুন, এখানে খুবই মজার অদ্ভুত কাহিনী রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কমান্ডোরা আমার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল এবং তারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ... আমি জানি যে, ওরা খুবই বর্বর এবং ওদের মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই। ওদের উদ্দেশ্য ছিল আমার সব লোককে হত্যা করা। তারা একটা গণহত্যা করবে। আমি ভাবলাম আমি যদি মৃত্যুকে বেছে নিই, তাহলে যে জনগণকে আমি এত ভালোবাসি, তারা হয়তো রক্ষা পাবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি তো সম্ভবত কলকাতায় চলে যেতে পারতেন?

শেখ মুজিব : আমি যদি তৈরি থাকতাম, তাহলে আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার লোকদের পেছনে ফেলে তা কী করে সম্ভব। আমি একটা জাতির নেতা। আমি যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বেছে নিতে পারি। তাই আমি সবাইকে প্রতিরোধের আহ্বান জানালাম।

ডেভিড ফ্রস্ট : নিশ্চয় আপনি ঠিক পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর এজন্যেই ৯ মাস ধরে গণমানসে আপনি উচ্চ আসন লাভ করেছেন। জনসাধারণ আপনাকে প্রায় মহামানব হিসেবে দেখে?

শেখ মুজিব : আমি তা বলি না। কিন্তু আমি বলি, তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের ভালোবাসি এবং তাদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই বর্বরগুলো আমাকে গ্রেফতার করে আমার বাড়ি ধ্বংস করেছে। আমার বাবা-মা যে বাড়িতে থাকতো সেই বাড়ি ধ্বংস করেছে। আমার বাবার বয়স এখন (১৯৭২ সালে) ৯০ বছর এবং মায়ের বয়স ৮০। তাঁরা আমার গ্রামের পূর্বপুরুষদের বাড়িতে বসবাস করতো। কিন্তু সেখানেও সৈন্য বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। আমার পিতা-মাতাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে বাড়িটা পোড়ানো হয়েছিল। তারা গৃহহীন হলেন। ভোরে সৈন্য বাহিনীর লোকেরা সবকিছুই পুড়িয়ে ফেলেছিল।

আমি ধারণা করেছিলাম, আমাকে যদি ওরা গ্রেফতার করতে পারে, তাহলে অন্তত ওরা আমার জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমার পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী। জনতার সমর্থনে আমি এমন একটা পার্টি সংগঠিত করেছি, যারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম। আমি বলেছিলাম, তোমরা প্রতিটি ইঞ্চির জন্য সংগ্রাম করবে। আমি এই কথাও বলেছিলাম, তোমরা মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত (সম্ভবত সেটা আমার শেষ নির্দেশ) তোমরা লড়াই চালিয়ে যাবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা আপনাকে কোন অবস্থায় গ্রেফতার করল? তখন তো রাত দেড়টা ছিল, তাই না? এরপর কী হলো?

শেখ মুজিব : ওরা প্রথমেই মেশিনগান দিয়ে আমার বাড়ির দিকে গুলিবর্ষণ করল।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি তখন কোথায় ছিলেন। ওরা কখন এসে হাজির হলো?

শেখ মুজিব : আমরা শোবার ঘরে বসেছিলাম–এটাই হচ্ছে আমার শোবার ঘর। ওরা ওই পাশ থেকে মেশিনগানের গুলি শুরু করল। এদিকটাতেও কয়েকটা মেশিনগান ছিল। ওরা জানালায় গুলি করল।

ডেভিড ফ্রস্ট : তাহলে এসব কিছু ধ্বংস হলো?

শেখ মুজিব : সবকিছুই বিনষ্ট হলো। আমি আমার পরিবারকে নিয়ে এখানেই অবস্থান করছিলাম। আমার ছয় বছরের বাচ্চা বিছানায় ঘুমাচ্ছিল। আর আমার স্ত্রী দুটো ছেলেকে নিয়ে এই ঘরেই ছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট : পাকিস্তানি সৈন্যরা কোন দিক দিয়ে এসে ঢুকল?

শেখ মুজিব : সবদিক দিয়েই। ওরা জানালা লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল। তখন আমি স্ত্রীকে দুটো ছেলেকে নিয়ে বসে থাকতে বললাম। আর আমি ঘরের বাইরে এলাম।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার স্ত্রী তখন কী বললেন?

শেখ মুজিব : একটা শব্দও করল না। বিদায়ের প্রাক্কালে আমি ওকে চুমু খেলাম। আমি দরজা খুলে বের হয়ে এসেই সৈন্যদের গুলি থামাতে বললাম। আমি চিৎকার করে উঠলাম 'গুলি বন্ধ করো'। এই যে আমি এখানে। কেন তোমরা গুলি করছ। কিসের জন্য। তখন খোলা বেয়নেট হাতে চার্জ করার জন্য সবদিক থেকে সৈন্যরা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার কাছেই দাঁড়িয়ে একজন অফিসার। সে আমাকে ধরে ফেলেই হুকুম দিল, ওকে হত্যা করো না।

ডেভিড ফ্রস্ট : কেবল একজন অফিসার ওদের থামাতে পারল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ। এরপর ওরা আমাকে নিয়ে চলল। ওরা আমাকে এই জায়গা থেকে টেনেহিচড়ে নিচে নিতে শুরু করল। আর আমার পেছন দিক দিয়ে ঘুসি মারা ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্রের কুঁদা দিয়ে গুঁতাতে লাগল। আর্মি অফিসার আমার হাত ধরে রাখা সত্ত্বেও সৈন্যরা আমাকে নিচে নেওয়ার জন্য টানতে লাগল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। দাঁড়াও, আমি আমার পাইপটা আর তামাক সাথে করে নিয়ে আসি। না হলে ওগুলো নিয়ে আমার স্ত্রীকে আসতে দাও। পাইপ আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

এরপর আমি আবার ঘরে এলাম। দেখলাম, আমার স্ত্রী দুটো ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাকে পাইপ আর একটা ছোট স্যুটকেস দিল। আমি চলে এলাম। দেখলাম আশপাশে আগুন জ্বলছে। এখান থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা ছেড়ে চললেন তখন কি আপনার একবারও মনে হয়েছিল যে, আপনি আর ফিরে আসতে পারবেন?

শেখ মুজিব : না, আমি ফিরে আসার কথা চিন্তা করিনি। আমার মনে হয়েছিল, এটাই আমার শেষ যাত্রা। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে, মাথা উঁচু করে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি, তাহলে আমার দেশবাসীর লজ্জার কিছুই থাকবে না। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আমি যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমার দেশবাসী সারা বিশ্বে আর মুখ দেখাতে পারবে না। জনগণের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া শ্রেয়।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি একবার বলেছিলেন, 'যে লোক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে তাঁকে হত্যা করা যায় না।'

শেখ মুজিব : আমি তাদের বলেছিলাম, যে মানুষ মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকে তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আপনি দৈহিকভাবে একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন; কিন্তু তাঁর আত্মাকে হত্যা করা যায় না। এটা আমার বিশ্বাসের অঙ্গ। আমি একজন মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুসলমানের মৃত্যু একবারই হয়–দুইবার নয়।

আমি একজন মানুষ। তাই আমি মানবাত্মাকে ভালোবাসি। আমি এই জাতির নেতা। এঁরা আমাকে ভালোবাসে, আমি এঁদের ভালোবাসি। এখন এঁদের কাছ থেকে আমার পাওয়ার কিছু নেই। এঁরা আমার জন্য সর্বস্ব দিয়েছে। কারণ আমিও সবকিছু দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি এঁদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। এখন আর আমার মৃত্যুভয় নেই। ..আমি এঁদের সুখী দেখতে চাই..।

ডেভিড ফ্রস্ট : আমি জানতে পেরেছি যে, যখন ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিল তখনও নাকি সে বলেছিল, আপনাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। এ কথা কি সত্য?

শেখ মুজিব : নিখুঁত সত্য। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ঘটনা, যা ভুট্টো নিজেই আমাকে বলেছে। ইয়াহিয়া খান তাঁকে বলেছিল, 'আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা না করে সবচেয়ে বড় ভুল করেছি।'

ডেভিড ফ্রস্ট : এ কথা সে (ভুট্টো) বলেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ ভুট্টো আরও বলেছিল যে, ইয়াহিয়া তাঁকে অনুরোধ করেছিল, 'ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে আমাকে দয়া করে একটা কাজ করতে দেওয়া হোক। আগের কোনো তারিখের আদেশ দেখিয়ে মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হোক।' কিন্তু ভুট্টো এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো জবাবে কী বলেছিল। সে কথা কি আপনাকে বলেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো কী জবাব দিয়েছিল?

শেখ মুজিব : ভুট্টো বলেছিল, 'আমি এটা করতে দিতে পারি না। কেননা তখন এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। ১ লাখ ২০ হাজার সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক ব্যক্তি বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর কাছে আটক আছে। এছাড়া পাঁচ থেকে ১০ লক্ষ অবাঙালি বাংলাদেশে বসবাস করছে। যদি আপনি শেখ মুজিবকে এখন হত্যা করেন এবং আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে আমি আর কোনো দিন বেঙ্গল থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে আসতে পারব না। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হবে এবং তা আমার জন্য বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি করবে। আমি ভুট্টোর কাছে খুব কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যদি ইয়াহিয়া খানের মুখোমুখি হন, তাহলে আপনি কী বলবেন?

শেখ মুজিব : সে একজন অপরাধী। আমি তার ফটো পর্যন্ত দেখতে চাই না। সে তাঁর সৈন্যবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে।

লেখক: প্রভাষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক জীবন এবং প্রেস কাউন্সিল গঠন

শামীমা চৌধুরী

ভূমিকা

১৯৭৯-২০১৭ এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দেশের সংবাদপত্র শিল্পকে গতিশীল, জনবান্ধব, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপ্রবাহকে নিশ্চিত করছে একদিকে, অন্যদিকে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আর এর পেছনে আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদান। তিনি যেভাবে একটি জাতির মুক্তিদাতা ও স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে উঠেছিলেন এর পেছনে ছিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অবদান। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য একটি অভিভাবক প্রতিষ্ঠান দরকার, যার বাস্তবতা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার কালীচরণ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের রংপুর থেকে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশের যাত্রা শুরু। এরপর এ জেলা থেকেই প্রকাশিত 'দিন প্রকাশ' এবং কুষ্টিয়া থেকে কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত 'গ্রামবাংলা প্রকাশিকা' সংবাদপত্র শিল্পকে পাঠকের দোরগোড়ায় নিয়ে আসে। সেই থেকে আজও সংবাদপত্র স্বমহিমা, স্বমর্যাদা, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা আর জবাবদিহিতা নিয়ে টিকে আছে।

সংবাদপত্র পরিচালিত হয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত আচরণবিধি, হাউসের নিজস্ব নীতিমালা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সংবাদপত্র।

প্রথমদিন থেকে সংবাদপত্রের ওপর মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির যে নির্ভরতা, তা আজও পরিবর্তন হয়নি। এখন গণমাধ্যম অনেক বিস্তৃত। সংবাদপত্র ছাড়াও বিভিন্ন বার্তা সংস্থা, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, সরকারি-বেসরকারি রেডিও, অনলাইন পত্রিকা, অনলাইন বার্তা সংস্থা, অনলাইন রেডিও, অনলাইন টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও– সব মিলিয়ে গণমাধ্যমের জগৎ অনেক প্রসারিত। গণমাধ্যমের যত শাখা আছে এর মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ক্ষমতায়ন ও সুশাসন বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশা ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছে সংবাদপত্র।

গত শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে গণতন্ত্রের যে ঢেউ বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়ে, তাতে অনিবার্যভাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা হয়ে ওঠে আরও বহুমুখী। তাই বলা হয়, সংবাদপত্র রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। প্রতিমুহূর্তে ঘটে যাওয়া তথ্য বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা রয়েছে সংবাদপত্রের। এ মাধ্যমটি সরকারকে জনগণের চাহিদা, প্রত্যাশা, সাফল্য ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেয়। অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়ন নিয়ে সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রতিদিনের সংবাদপত্র দিনের প্রথমভাগেই পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত এলাকায়– পাঠকের হাতে। রাতে বিভিন্ন চ্যানেলের সুবাদে অনেক তথ্য জানা থাকলেও সংবাদপত্রের পাতায় তা দেখতে চায় পাঠক বিস্তারিতভাবে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে এখনও সংবাদপত্রকেই তাঁর তথ্যপ্রাপ্তির উৎস মনে করে। তাছাড়া এখানে আছে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ। এখন দেশের শুধু বড় শহরগুলোয় নয়, জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আধুনিক গেটআপে-মেকআপে সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ এ পেশার সাথে সংশ্লিষ্টদের জীবনের মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের অনেক আগেই স্বাধীন বাংলাকে সহস্রাব্দের উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানোর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র শিল্প এবং সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে তাঁরই নির্দেশ ও উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তিনি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আজকের যে সাফল্য, তা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নেরই বাস্তব রূপরেখা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর শারীরিক ও মানসিক গঠনে বাংলার সুবজ-শ্যামল প্রকৃতি, খেটে খাওয়া মানুষ, দরিদ্র-নিঃস্ব মানুষের প্রভাব ছিল প্রবল। প্রত্যন্ত জনপদে টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া খোকা এদের প্রভাবেই হয়ে উঠেছিলেন বাংলার ও বিশ্বের অন্যতম অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। রাজনীতির বাইরে কবি, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, শিল্পী, আমলা, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। বিশেষ করে সাংবাদিকদের সাথে। টুঙ্গিপাড়ার খোকা একটি জাতির মুক্তিদাতা ও স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে উঠেছিলেন। এর পেছনে ছিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অবদান, যা তিনি সবসময় উপলব্ধি করতেন। আর তিনি নিজেও কিছুদিন এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। তাই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উন্নয়নে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। এই পেশার দায়িত্ব কী, কীভাবে এ পেশার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়– এ বিষয়গুলো তিনি বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে-বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। এ দিন তিনি তাঁর ভাষণে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা, আপনারা জানেন, আমি আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে। সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজ কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করি নাই।'

সাংবাদিকতার আদর্শ সম্পর্কে তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রেও একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনই একটা মূলনীতি আছে।'

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখন থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে এ দেশের সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না। এজন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, 'এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা', 'বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ' ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?'

সংবাদপত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা চরম সাম্প্রদায়িক। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন, তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।'

(সূত্র : নিরীক্ষা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জুলাই-আগস্ট, ২০১৩, পৃ. ৭-৯, ১৮-১৯)

মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ইত্তেফাক এবং সংবাদ পত্রিকার পুনর্বাসনে তিনি এগিয়ে দিয়েছিলেন সহযোগিতার হাত। যে সাংবাদিকরা বেকার ছিলেন তিনি তাঁদের সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক জীবন

বঙ্গবন্ধু নিজেও কিছুদিন সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি। তবে তিনি নিজেই যে সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক ছিলেন, সে কথা কখনও কোনো ভাষণে তিনি উল্লেখ করেননি। এ তথ্যটি জানা যায়, ২০১২ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে। সেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক-জীবনের নানা কথা। কলকাতা থেকে চল্লিশের দশকে দৈনিক আজাদের পর মুসলমানদের উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেহাদ নামে আরও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইত্তেহাদ কেন প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর প্রকাশনার পেছনে কারা ছিলেন, সে প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ... হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হতে চাইলেন। কারণ, মওলানা আকরম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করেছিলেন। শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। হাশিম সাহেব রাগ করে লীগ সেক্রেটারি পদ থেকে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা আসতেন মিল্লাত প্রেসেই থাকতেন। হাশিম সাহেব এই সময় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের অনেকেরই মোহ তাঁর উপর থেকে ছুটে গিয়েছিল সে অনেক কথা। তিনি কলকাতা আসলেই শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। এর প্রধান কারণ ছিল মিল্লাত কাগজকে দৈনিক করতে সাহায্য না করে তিনি ইত্তেহাদ কাগজ বের করেছিলেন নবাবজাদা হাসান আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনা এবং আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের সম্পাদনায়। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দৈনিক আজাদও ক্ষেপে গিয়েছিল শহীদ সাহেবের উপর। কারণ, পূর্বে একমাত্র আজাদ ছিল মুসলমানদের দৈনিক। এখন আর একটা কাগজ বের হওয়াতে মওলানা সাহেব যতটা নন, তাঁর দলবল বেশি রাগ করেছিল।' [শেখ মুজিবুর রহমান : অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ২০১১, পৃ. ৭২]।

বঙ্গবন্ধুর এই লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দৈনিক ইত্তেহাদ বের হওয়ার পেছনে তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী একদিকে যেমন মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, তেমনি আবুল হাশিমদের মিল্লাত পত্রিকার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর অনুসারী আবুল মনসুর আহমদকে সম্পাদক করে নতুন কাগজ প্রকাশিত হলো দৈনিক ইত্তেহাদ। [শেখ মুজিবুর রহমান : অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ২০১১, পৃ. ৭২]।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'মানিক ভাই তখন কলকাতায় ইত্তেহাদ কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের টাকা-পয়সার খুবই প্রয়োজন। কে দিবে? বাড়ি থেকে নিজেদের লেখাপড়ার খরচটা কোনোমতে আনতে পারি, কিন্তু রাজনীতি করার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? আমার একটু সচ্ছল অবস্থা ছিল, কারণ আমি ইত্তেহাদ কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম। মাসে প্রায় তিনশত টাকা পেতাম। আমার কাজ ছিল এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করা, আর ইত্তেহাদ কাগজ যাতে চলে এবং নতুন এজেন্ট বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা যায় সেটা দেখা। বেশিদিন ছিলাম না। তবু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ কাগজে নাম আছে, টাকা বাড়ি থেকেও কিছু পাওয়া যাবে।' [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮]

বঙ্গবন্ধুর এই লেখা থেকেই বোঝা যায়, দৈনিক ইত্তেহাদ-এর তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' (পূর্ব বাংলার) প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর বেতন ছিল মাসিক তিনশত টাকা। এত টাকা বেতন তখন কোনো সচিবও পেতেন না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পড়লে কলকাতা থেকে বঙ্গবন্ধু এবং অন্যরা ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় আসার পর বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তবে তার প্রভাব যে তখনো দৈনিক ইত্তেহাদে ছিল তার কিছু তথ্য পাওয়া যায় আত্মজীবনীতে। যেমন, 'আমি ঢাকায় এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বইপুস্তক কিছু কিনলাম। ঢাকায় এসে শুনলাম গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সভা হয়ে গেছে। কার্যকরী কমিটির নতুন সভ্য কো-অপ্ট করা হয়েছে। পূর্বে ছিলাম সতেরজন এখন হয়েছে চৌত্রিশজন। কারণ, আমাদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র। আমাদের অনেকে নোটিশও পায় নাই। অন্য কোন কাগজ না ছাপলেও কলকাতায় ইত্তেহাদ কাগজ আমাদের সংবাদ ছাপাত ইত্তেহাদেও নোটিশ ছাপানো হয় নাই।' [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭]

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা ও কর্ম প্রয়াস

স্বাধীনতা লাভের পর পরই বঙ্গবন্ধু প্রেস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেন। সংবাদপত্র শিল্পের ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল, জনবান্ধব করা, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার প্রসার ঘটানো, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা এবং হলুদ সাংবাদিকতা রোধের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৪ সালের অ্যাক্টের আলোকে (প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ১১-বি ধারা, ২০০২ সালে যা সংশোধিত) একটি আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা হয় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৮ বছর ধরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সংবাদপত্র শিল্পের গাইড হিসেবে কাজ করে চলেছে। দেশে সংবাদপত্র শিল্পের অবস্থাকে গতিশীল ও উন্নয়নের হাতিয়ার করতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল যে আচরণবিধি প্রণয়ন করে, এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে:

১. দেশের যে কোনো সংবাদপত্র ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী কোনো তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সমুন্নত রাখবে।
২. সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হবে, তা সবই হবে জনস্বার্থে। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে, এমন বিষয়কে সংবাদপত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য হতে হবে নির্ভুল ও সত্য।
৪. গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয় তবে সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন।
৬. কুৎসামূলক বা জনস্বার্থ পরিপন্থি না হলে বাহ্যত ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যে কোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এই ধরনের বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদাহানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৮. অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি; এ কারণে যে সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তিনি সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।
৯. কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলাবিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায় প্রভাবিত হতে পারে, এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকতে হবে।
১০. সম্পাদকীয়র কোনো ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।
১১. বিদ্বেষপূর্ণ কোনো খবর প্রকাশ করা যাবে না।
১২. সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।
১৩. কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করতে হবে। (সূত্র : বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল)

উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেরই নিজস্ব নীতিমালা ও আদর্শ রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত আচরণবিধি এর বিরোধী কিছু নয়। আর এ কারণেই দেশের সংবাদপত্র শিল্প গণমাধ্যমের শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

প্রেস কাউন্সিলের সাফল্য

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ঢাকায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা সেই সম্মেলনে তাঁদের মতামত দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই মতামত বাস্তবে রূপ দিতে অনেকটা পথ পেরিয়ে যায় প্রেস কাউন্সিলের। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কর্মপ্রয়াস শুধু দায়েরকৃত মামলা, মামলা নিষ্পত্তি এবং ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাকে বলা যায়, রুটিনমাফিক কাজ। কাউন্সিল সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলেছে এখন। ২০১৪ সালে বর্তমান চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এ কর্মপ্রয়াস পৌঁছে যায় তৃণমূলে। বিশেষ করে সাংবাদিকদের আচরণবিধি ও নীতিমালা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁর দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল শুরু থেকে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত ৫১৭টি মামলার মধ্যে ৫১২টির রায় প্রদান করেছে। এর মধ্যে ২০১২ সালে দৈনিক কালের কণ্ঠ বনাম দৈনিক প্রথম আলোর মামলার রায়টি দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সাংবাদিকতার নীতিমালা, আচরণবিধি এবং হলুদ সাংবাদিকতার ওপর দেশব্যাপী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রশংসিত হয়েছে। এই প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

অযোগ্য-অদক্ষ ব্যক্তিরা যাতে সাংবাদিকতা পেশায় আসতে না পারে, এজন্য রেজিস্ট্রিকৃত সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা পর্যায়ে রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে সাংবাদিকদের সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে, অন্যদিকে প্রতিহত করা যাবে ভুয়া সাংবাদিকদের। পাশাপাশি রেজিস্ট্রিবিহীন সংবাদপত্রের মালিকরা সহজেই ধরা পড়বে। রেজিস্ট্রিকৃত সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের নাম তালিকাভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। এটি দফতরে সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল তাদের কর্মপ্রয়াসকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ভারত ও নেপালের সাথে সমঝোতা স্মারক(এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের ন্যাশনাল ডে উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। নেপাল প্রেস কাউন্সিলের আমন্ত্রণে কাঠমান্ডুতে সার্কভুক্ত দেশের প্রেস কাউন্সিলকে নিয়ে একটি জোট গঠনের প্রস্তুতিসভায় যোগ দেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

উপসংহার

চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে এখন এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সংবাদপত্র, বিভিন্ন বার্তা সংস্থা, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, সরকারি-বেসরকারি রেডিও, অনলাইন পত্রিকা, অনলাইন বার্তা সংস্থা, অনলাইন রেডিও, অনলাইন টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও–সব গণমাধ্যমেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত যে সুখী সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে তা বাস্তবতা পেয়েছে। এ বাস্তবতারই অংশ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বর্তমান প্রয়াস।

লেখক: জ্যেষ্ঠ গবেষক, পিআইবি

গণমাধ্যম ও বঙ্গবন্ধু

মো. আবদুল রকিব খান

'যদি রাত পোহালেই শোনা যেত, বঙ্গবন্ধু মরে নাই।
যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো,
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই।
তবে বিশ্ব পেত
এক মহান নেতা,
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।'

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসামান্য রাজনৈতিক দক্ষতা, মেধা দিয়ে সারা বিশ্বকে অবাক করেছিলেন। BBC তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইংল্যান্ডের Newsweek

পত্রিকা তাঁকে রাজনৈতিক মহাকবি (Poet of Politics) এবং বিশ্ব শান্তি পরিষদ শান্তির জন্য জুলিও-কুরি উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

বিশিষ্ট লেখক মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ইতিহাসের মূল লক্ষ্য একটি সমাজ ও জাতি, কিন্তু কোন সমাজে বা জাতিতে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার কার্যকলাপ সেই সমাজ বা জাতিকে এক নতুন মহাত্মে অভিষিক্ত করে, নতুনভাবে আলোড়িত করে একটি দেশ, সমাজ বা নব জন্মদান- শেখ মুজিব এমনই একজন অসাধারণ ব্যক্তি।'

একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় যার হাত ধরে, তাকে জাতির জনক বলা হয়। মহান মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি স্বাধীন জাতির জন্ম হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। এটি বহু দিনের, বহু যুগের আন্দোলনের ফসল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালি জাতির পিতা। এই নামের পূর্বে ও পরে ব্যবহৃত দুইটি বিশেষণ সরাসরি জাতির কাছ থেকে প্রাপ্ত। তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন, মহান মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধের মাধ্যমে ভাষা, মানচিত্র, আত্মপরিচয় এবং স্বতন্ত্র একটি ভূখণ্ড দিয়ে বাঙালি জাতিকে বিশ্বের মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পর আজকের এই বাংলাদেশ। যিনি কোনো দিন কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। যে নাম শাশ্বত সত্য। যে নাম চির স্মরণীয়, যার ডাকে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। যার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল– অগ্নিঝড়া বাণী–

'এবারের সংগ্রাম– মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম– স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তিনি অকুতোভয় বীর সেনানী। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক, তিনি মিশে আছেন বাঙালি জাতির নিশ্বাসে-বিশ্বাসে। তিনি আমাদের গৌরব, তাঁকে সম্মানিত করলে আমরা হই সম্মানিত। তিনি বিশ্বের এক কিংবদন্তি পুরুষ। তাঁর আগমন ও তাঁর সংগ্রামশীল নিষ্ঠার কারণে বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও কাহিনী অনেক তথ্য এখনো অনুদ্ঘাটিত। যে বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজন।

আপসহীন হিমালয়সম সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বধারী বঙ্গবন্ধু কেবল একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদই ছিলেন না, তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবন পৌঁছে দেয় অবিসংবাদিত নেতার অবস্থানে। দেশের রাজনৈতিক স্রোতধারায় ভাঙা-গড়ার তরঙ্গে তাঁর রাজনীতির উন্মেষ ও উত্থান ঘটেছিল। তাঁর রাজনৈতিক সূচনাপর্বটি ছিল ১৯৩৭ সাল থেকে। এ বছর নির্বাচন ও ফলাফলকে কেন্দ্র করে ভাগ্যনির্ভর মুসলিম সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজনীতিকে গণমুখী করতে কিছুসংখ্যক ছাত্রসমাজ মাঠে নামে, তিনি (বঙ্গবন্ধু) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি এবং বেকার হোস্টেলে আবাসিক হলে রাজনৈতিক প্রতিভার আলো ছড়ানোর সুযোগ আসে তাঁর জীবনে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম ছাত্রদের সিংহভাগ অবদান ছিল এই কলেজের ছাত্রদের। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং এ কে ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল। গণতন্ত্র ও রাজপথের রাজনীতি শিখেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে। সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা নিয়েছেন সুভাষ বসুর কাছ থেকে। এ কে ফজলুল হকের এই বাণীতে বিশ্বাস করতেন বঙ্গবন্ধু।

'এ দেশ হিন্দুর নয়, এ দেশ মুসলমানেরও নয়,
এ দেশকে যে নিজের ভাববে, এ দেশ তার।
এ দেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে, এ দেশ তার।
আর তার এবং তাদের এ দেশ এবং যারা
এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য
সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।'

একনজরে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সকালের সূর্যোদয় যেমনি বলে দেয় দিনটি কেমন যাবে, ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের বিচিত্র ঘটনাবলি ভবিষ্যৎ বঙ্গবন্ধুর পরিচয়বার্তা তুলে ধরে। শৈশব থেকেই সমাজের মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁকে ব্যথিত করে তুলত। অন্যায় আর অসংগতির বিরুদ্ধে শৈশব থেকেই ছিলেন সোচ্চার আর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার রাত ৮ টায় মধুমতী নদীর তীরবর্তী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। মাতা সায়েরা খাতুন, দাদা শেখ আবদুল হামিদ, নানা শেখ আবদুল মজিদ। ৪ বোন ও ২ ভাইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু তৃতীয়। ডাক নাম খোকা, মিঞা ভাই। ১৯২৭ সালে শিমাডাঙ্গা (শেখ আবদুর রশিদ এম ই স্কুল) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ শীতনাথ একাডেমিতে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৫ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী আবদুল হামিদ খান মাস্টার। ১৯৩৪ সালে ১২ বছর বয়সে বেরিবেরি এবং ১৯৩৭ সালে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন। ফুটবল ও ভলিবল খেলা ভালোবাসতেন। ব্রতচারী নৃত্যের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। স্কুল পরিদর্শন করে ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রবাস সংস্কারের জন্য দাবি জানান। দুই মহান নেতার সামনে দাঁড়িয়ে দাবি উত্থাপন করায় তাৎক্ষণিক প্রধানমন্ত্রী ১২০০ টাকা বরাদ্দ দেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই নেতার সংস্পর্শে থেকে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে চাচাতো বোন শেখ ফজিলাতুননেছার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন

> *তিনি অকুতোভয় বীর সেনানী। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক, তিনি মিশে আছেন বাঙালি জাতির নিশ্বাসে-বিশ্বাসে। তিনি আমাদের গৌরব, তাঁকে সম্মানিত করলে আমরা হই সম্মানিত। তিনি বিশ্বের এক কিংবদন্তি পুরুষ। তাঁর আগমন ও তাঁর সংগ্রামশীল নিষ্ঠার কারণে বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও কাহিনী অনেক তথ্য এখনো অনুদ্ঘাটিত। যে বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজন।*

স্কুল থেকে প্রবেশিকা (এন্টার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে টুঙ্গিপাড়ায় দুর্ভিক্ষে জনগণের মধ্যে বাড়ির গোলার ধান-চাল বিলিয়ে দেন। ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বিএ পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। রোল নং-১৬৫-এমএস। ১৯৪৭ সালেই গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্তিকালে শান্তি মিশনের কর্মী হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কলকাতায় ছিলেন। ১৯৪৭ সালে শুরু হয় বাংলা ভাষার আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। এককভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করে মুচলেকা এবং জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, ২০১০ সালের ১৪ই আগস্ট ওই বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরান ঢাকার কে এম দাস লেন রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। খাদ্য সংকট সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের দায়ে ওই বছর গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি জেল থেকে সমর্থন জানান এবং ১৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ওই দিনই মুক্তি পান। ১৯৫২ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে ১৭ই এপ্রিল পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে আবার পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যোগদান করে স্টকহোমে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভা সফর করেন। চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় যান। পাকিস্তান ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ২০ অক্টোবর সামরিক জান্তার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর মুক্তি পান। ১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার সংক্রান্ত আন্দোলনের দায়ে গ্রেফতার হন। ১৯৬৩ সালে মৃত আওয়ামী লীগকে পুনরায় জীবিত করেন। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতিমা জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে মারা যান। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানান, পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য দাবি জানান। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ১লা মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছয় দফার দাবিতে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় ও মহকুমায় সভা ও পথসভা করেন। ৮ মে গ্রেফতার হন। ৭ জুন গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামি হিসেবে জেলগেট থেকে গ্রেফতার হন। সংগ্রামী জনতা, ছাত্র, শ্রমিক ও তৃণমূল আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে পড়েন। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রচারণার অধিকার দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি রাজশাহীতে স্মরণকালের বৃহত্তর জনসভায় ভাষণ দেন। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৭৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শপথ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেন। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু হরতাল পালনের জন্য আহ্বান জানান। ৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাম ঘোষণা করেন। জিন্দাবাদের পরিবর্তে 'জয় বাংলা' স্লোগান চালু করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। ২৫ মার্চের পূর্বে বঙ্গবন্ধু কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিভিন্ন জায়গায় বার্তা প্রেরণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। ৭ই অক্টোবর ১৯৭১ পাকিস্তানের আদালতে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, ৯ মাস যুদ্ধ হওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের পাঠানো বিমান দিয়ে লন্ডন গমন করেন। লন্ডনে সাংবাদিক মাসকারেনহাস এবং নিকোলাস ক্যারল বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লি হয়ে দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার (কুলাঙ্গার) ও ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে (১৮ জন) হত্যা করে গণতন্ত্র এবং বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চিরদিনের মতো স্তম্ভিত করে দেয়।

> *সংবাদ, সংবাদপত্র, সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সঙ্গে গড়ে নিয়েছিলেন একটি আত্মিক সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু যখন ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন, তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সে সময় প্রতিদিনই পত্রিকায় স্থান পেতেন। গণমাধ্যমকর্মীরা লক্ষ করেছিলেন যে, এই তরুণ নেতার মধ্যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই গণমাধ্যম নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি, প্রতিদিনই পত্রিকায় তুলে ধরত।*

গণমাধ্যম ও বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের একান্ত সাথী ছিল বিভিন্ন গণমাধ্যম। দেশ-বিদেশের গণমাধ্যম, সাংবাদিক, সংবাদকর্মী সহযোদ্ধার মতো লেগে থেকে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য, আবেগ, অনুভূতিকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। গণমাধ্যম প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে থেকে কঠিন সংগ্রামে সহযোগিতা করেছিল। তিনি নিজে ছিলেন গণমাধ্যমবান্ধব কিংবদন্তি নেতা। প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যম ছিল বঙ্গবন্ধুর বান্ধব আবার বঙ্গবন্ধুও ছিলেন গণমাধ্যমের বান্ধব। রাজনীতির প্রথম দিন থেকেই তিনি ছিলেন কোনো কোনো সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বা একান্ত সহযোগী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নির্যাতিত ও শোষিত জাতির অধিকার আদায়ে গণমাধ্যমই হতে পারে সহযোদ্ধা। তাই সংবাদ, সংবাদপত্র, সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সঙ্গে গড়ে নিয়েছিলেন একটি আত্মিক সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু যখন ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন, তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সে সময় প্রতিদিনই পত্রিকায় স্থান পেতেন। গণমাধ্যমকর্মীরা লক্ষ করেছিলেন যে, এই তরুণ নেতার মধ্যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই গণমাধ্যম নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি, প্রতিদিনই পত্রিকায় তুলে ধরত।

কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দৈনিক আজাদ অফিসে সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অর্থানুকূল্যে দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ও বিক্রির কাজে বঙ্গবন্ধুর দায়িত্বশীল ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এ পত্রিকার সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে খাজা নাজিম উদ্দিন সরকার পূর্ব বাংলায় এ পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলে দলের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়। মওলানা ভাসানী ছিলেন সম্পাদক। ইয়ার মোহাম্মদ খান ছিলেন প্রকাশক। পত্রিকা পরিচালনার সব দায়িত্ব পালন করতেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। পত্রিকার অর্থ সাহায্য করতেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দলীয় কর্মীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু পত্রিকা বিক্রির কাজ করেছেন। ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পূর্বে ইত্তেফাক সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে আইয়ুব সরকার দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়। মানিক মিয়া পত্রিকার হাল ছেড়ে দিয়ে করাচিতে চাকরি নিয়ে চলে যেতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বাধা দিয়ে তাকে সাহস জোগান এবং অনুরোধ করে রাখেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, তার পক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক জনমত গড়ে তুলে জেনারেল আইয়ুব খানের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ছয় দফার মধ্যে ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক পরামর্শক ও বড় ভাইয়ের মতো। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে– 'আমরা একই পিতার দুই সন্তান, বা একই নেতার দুই শীর্ষ।' মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর জেল থেকে ঐতিহাসিক চিঠি লিখেছেন, 'আমাদের মানিক ভাই'।

১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় পত্রিকাগুলো সাহসী ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর পাশে একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়েছিল গণমাধ্যম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোর্ট রিপোর্টিং, ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি পত্রিকায় ছাপা হতো। এমন কী মুসলিম লীগের দৈনিক আজাদও বঙ্গবন্ধুর পাশে না দাঁড়িয়ে পারেনি। গণমাধ্যমের কল্যাণে ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব বাধ্য হয়ে সব দাবি মেনে নিয়েছিল– পত্রিকাগুলোর সংবাদ, কলাম ও সম্পাদকীয় বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করেছিল। বঙ্গবন্ধুর সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও একাত্মতা ছিল– এটাই তার বড় প্রমাণ। বঙ্গবন্ধু এক বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে বিরাজ করেছিলেন, তার পরিচয় তখনকার সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন যে, তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতে সবাই প্রস্তুত ছিলেন। কাগমারিতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনের সময় সাংবাদিকরা যাতে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করতে পারেন তার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল একটি অস্থায়ী ডাকঘর। আজকের সাংবাদিকদের কাছে হাসির হলেও বাস্তব সত্য ছিল। '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় গণমাধ্যম দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, বিবৃতি-ভাষণ, ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় টাইপে স্থান পেত। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পূর্ণ সমর্থন রেখেছে। ধাপে ধাপে মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। উজ্জীবিত করেছে। মানুষকে সচেতন করার যথার্থ কাজটি তখন গণমাধ্যমই করেছে। আপসহীন অকুতোভয় কিংবদন্তি নেতায় পরিণত করেছে বঙ্গবন্ধুকে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পত্রিকাগুলো পাক সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা মেনে প্রকাশ হতো। তাই ২৫শে মার্চ কালরাত্রে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ও গণহত্যার খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়নি। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রামের অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ পত্রিকা দুইটি দীর্ঘ ৯ মাস বন্ধ ছিল।

> *সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল আজীবন। তার একান্ত কক্ষে, সেটা যদি হয় শোয়ার ঘর সেখানেও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল গণমাধ্যমকর্মীদের। এ সম্পর্কটা একদিনে গড়ে উঠেনি। এর ভিত্তিটা ছিল বঙ্গবন্ধুর সহজ-সরল সাধারণ জীবনযাপন। তিনি নামে জানতেন অনেক সাংবাদিককে। দেশে-বিদেশে যেখানে-যখন সফরে গিয়েছেন একদল সাংবাদিক তার সঙ্গে থাকবেই। বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।*

পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুবিরোধী নানা ধরনের খবর ও সম্পাদকীয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান আমলের গোটা সময় সামরিক শাসক, স্বৈরশাসক। ওই সময় অপপ্রচার ও কুৎসাকে মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের প্রধান টার্গেট ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অন্য নেতারা মাঠে থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে একাই লড়তে হয়েছে। প্রচুর বিবৃতি ও ব্যাখ্যা প্রতিদিন দিতে হতো। সংবাদপত্রে প্রতিফলন হয়েছে বস্তুনিষ্ঠভাবেই।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল

একটি জাতির অগ্রগতির অন্যতম প্রধান সোপান হচ্ছে জাতীয় ঐক্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এ চারটি বিষয় হচ্ছে যে কোনো জাতির অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশকে সঠিক নেতৃত্বের বলে এক পতাকায় জড়ো করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন গরিবের সন্তান

একসময়ের কাঠুরিয়া আব্রাহাম লিংকন। ভলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে নতুনভাবে সংগঠিত করে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন মহা মতি লেলিন। আফিমের ঘোরে ক্লান্ত-শ্রান্ত চীনদের সুসংগঠিত করে মহা চীনকে বৈপ্লবিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন মাও সেতুং। ভারতকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে অসাধারণ নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তুরস্ককে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ করে মোস্তফা কামাল পাশা হয়েছিলেন আতাতুর্ক, তুর্কিদের পিতা। জীবনভর সংগ্রাম করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিদের দুঃশাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। যে স্বপ্ন নিয়ে সারাটা জীবন সংগ্রাম করে জীবনের ১৭টি বছর জেলের ভেতর নিভৃত জীবন কাটিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে কি পেরেছিলেন?

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল আজীবন। তার একান্ত কক্ষে, সেটা যদি হয় শোয়ার ঘর সেখানেও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল গণমাধ্যমকর্মীদের। এ সম্পর্কটা একদিনে গড়ে উঠেনি। এর ভিত্তিটা ছিল বঙ্গবন্ধুর সহজ-সরল সাধারণ জীবনযাপন। তিনি নামে জানতেন অনেক সাংবাদিককে। দেশে-বিদেশে যেখানে-যখন সফরে গিয়েছেন একদল সাংবাদিক তার সঙ্গে থাকবেই। বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক ডেবিট ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলেন। বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো যেমন- ভোয়া ও বিবিসি প্রায় প্রতিদিনই বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য প্রচার করত। বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্র শিল্পকে অত্যন্ত মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষতিগ্রস্ত দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকাকে পুনরায় দাঁড় করাতে সব রকম সহযোগিতা করেছিলেন। প্রেস ক্লাবকে আধুনিকীকরণ, প্রেস কাউন্সিল গঠন, পিআইবি, এফডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাসস ইত্যাদি সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংবাদকর্মী, সাংবাদিকদের জন্য বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা, ওয়েজবোর্ড গঠন বঙ্গবন্ধুই করেছেন। এককথায়– সংবাদপত্র ও সাংবাদিক ও বঙ্গবন্ধু একটি সুতোয় গাঁথা একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। ১৯৭২ -১৯৭৫ এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের শাসনকর্তা। এই সময়টার পুরো অংশজুড়েই বঙ্গবন্ধু শত-সহস্র ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী যে কেউ ডিক্লারেশন নিয়ে খবরের কাগজ বের করতে পারত। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো রকম বিধি-নিষেধ ছিল না। ফলে কয়েকটি পত্রিকা আজগুবি গল্প বের করত, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল ছিল না। পাকিস্তানের টাকায় কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ হতো। এগুলো বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুকে পর্যুদস্ত করতে এরা ছিল খুবই সক্রিয়। যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থায় যখন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত, ঠিক তখনই এই ষড়যন্ত্রকারীরা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। নিউজপ্রিন্ট একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল। এসব কথা বিবেচনা করে এনায়েত উল্লাহ খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি করেছিলেন। কমিটির সুপারিশে ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স ৭৫ ঘোষণা করেন। কেবল চারটি দৈনিক (১) বাংলাদেশ অবজারভার, (২) বাংলাদেশ টাইমস, (৩) দৈনিক ইত্তেফাক ও (৪) দৈনিক বাংলা, ১২২টি সাপ্তাহিক / ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অব্যাহত রেখে এবং রেডিও ও টিভি রেখে বাকিগুলো বাতিল করা হয়। তবে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কোনো একটি জেলা থেকে একটি করে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। যেসব পত্রিকা বন্ধ হলো তাদের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হলো। চাকরি না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা হলো। একটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল দেশকে একটি নতুন ধারায় আনার জন্য। নৈরাজ্য বন্ধ, দেশকে শান্ত করার জন্য এ সিদ্ধান্ত সীমিত সময়ের জন্য ছিল।

১৬ জুলাই ১৯৭২, জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন– 'সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, নীতিমালা মেনে পত্রিকাগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' আরও বলেন, 'যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করেছে। রাতারাতি কাগজ বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশিরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তাহলেও কি আপনারা বলবেন সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে।' (আংশিক)

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর গণমাধ্যমের ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসকে বিকৃত করতে শুরু করে। দীর্ঘ সময় গণমাধ্যম কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই সময়ের খবর বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়নি। শাসনকর্তারা ছিল চরমভাবে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী। গণমাধ্যমের সত্য বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা

১৯৭৫-এর ১৭ আগস্ট সকাল ১০টায় পত্রিকার সম্পাদকদের বঙ্গভবনে আসার ফরমান জারি হলো। প্রবীণতম সম্পাদক ওবায়দুল হক সাহেবের নেতৃত্বে ১০-১২ জন সম্পাদককে আধ ঘণ্টার বেশি সময় বঙ্গভবনের গেটে দাঁড় করিয়ে রাখল অস্ত্রধারীরা। সম্পাদকরা বললেন, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যদি ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে তারা চলে যাবেন। একথা বলার সাথে সাথে অস্ত্রধারীরা তাদের দিকে হিংস্রভাবে তেড়ে এসে তাদের মাথায় ও বুকের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে চিৎকার করে বলে উঠল- Shut up, Shut up you bastards, if you say a word, you are dead, all of you are dead. দেশের গণ্যমান্য সম্পাদকরা নিজেদের আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে খুনিদের হাতে তাদের লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা সেদিন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারেননি। (বঙ্গবন্ধু হত্যার গোপন পরম্পরা-মুসা সাদিক-পৃষ্ঠা-৫০)

পরিশেষে কবির কণ্ঠে-
'সাবাশ বাংলাদেশ,
পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে মরে ছাড়খার
তবু মাথা নোয়াবার নয়'

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রায় ৪২ বছর পর প্রমাণিত হয়েছে এই নামের মধ্যে রয়েছে এক অজেয় স্বর্গীয় শক্তি। যে শক্তি আজ বাংলা ও বাঙালির চেতনাকে আরো শানিত করে তুলেছে। এক্ষেত্রে বড় অবদান রেখে চলেছে গণমাধ্যম, লেখক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সব সময়েই বঙ্গবন্ধুবান্ধব। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের স্বরাজ এনে দিয়ে বলেছিলেন, রক্তে অর্জিত দেশটিকে আমার সোনার বাংলার সোনার বাংলায় পরিণত করব। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে আমাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর নামটি স্বর্ণাক্ষরে শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে আসীন হয়ে থাকবে। চিরকাল বাঙালি জাতি তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।
লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, ফাদার অব পলিটিক্স (আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী), মুজিব ভাই (এ বি এম মূসা), বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, নিরীক্ষা (পিআইবি), ইতিহাসের মহানায়ক (জয়শ্রী জামান), স্বাধীনতার মহানায়ক (এম আর এ তাহা), বঙ্গবন্ধু হত্যার গোপন পরম্পরা (মুসা সাদিক)।

লেখক: সাংবাদিক, শিক্ষক ও সংগঠক

বঙ্গবন্ধু নিজেই যখন লেখক ও সংবাদপত্রের মানুষ

শাহ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

সংবাদপত্রের মানুষ তথা সাংবাদিকগণকে জাতির বিবেক হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজে সত্য প্রচার ও সত্য প্রতিষ্ঠাই সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের কাজ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সংবাদপত্র বের করতে হতো যেখানে তাঁদের সাহস ও বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হতো। বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই পরিচালিত হতো সকল কর্মকাণ্ড। বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও রাষ্ট্রচেতনার মূর্ত প্রতীক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তাঁর চাইতে বেশি বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন আর কে ছিলেন? ঔপনিবেশিক শাসকদের সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অপরিসীম সাহসিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে তিনি মহামানবে পরিণত হয়েছিলেন তাঁর সময়ের (১৯২০-১৯৭৫) সকল বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিকতাকে পূর্ণসচেতনভাবে উপলব্ধিতে এনে, সময়ের কাজ সময়ে সুসম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিকে তিনি স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল বিকাশের বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যম জগৎটি যখন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের আনন্দের দিকটি এই যে, বঙ্গবন্ধু নিজেই একজন অত্যন্ত উঁচু মানের লেখক এবং রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি নিজেই সংবাদপত্র প্রকাশনা ও পরিচালনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আজকের রাজধানী ঢাকা থেকে যখন একটি দৈনিকও প্রকাশিত হতো না, তখন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীদের মতাদর্শ ও সংগঠনের আদর্শের প্রচার ও প্রচারণার জন্য সংবাদপত্র প্রকাশে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পরাধীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য সংবাদপত্র প্রকাশনা এক প্রকার অপরিহার্য ছিল। কারণ, তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের চলা লক্ষ্যই ছিল মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি। যেমন-শেরেবাংলা একে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬১) বের করেছিলেন 'নবযুগ'। 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের আবেগময় ও বলিষ্ঠ ভাষায় ব্রিটিশবিরোধী সম্পাদকীয় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দেশ, জনগণ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এমন সম্পাদকীয় ঐক্য সেকালে দুর্লভ ছিল।[১] মানুষকে সচেতন করা এবং নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রচার ও সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু নিজেই তা প্রকাশে বাস্তব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। ফলে সংবাদপত্রে লেখালেখি থেকে শুরু করে এ জগতের সদর-অন্দর মহলের সবকিছু সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আর সে কারণেই নিজের স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী লেখার গুরুত্ব নিজেই তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি নিজেকে একজন বিশ্বমানের লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নিজের দেশ ও সমাজের ইতিহাসের ঘটনাবলি মানুষকে জানানো এবং এর মধ্যদিয়ে সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠাই যেখানে একজন সাংবাদিক ও লেখকের প্রধান কাজ। এই প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে অমর ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন এবং তা আবার মানুষকে জানিয়েও গেছেন। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্বমানের বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিককে মূল্যায়ন করতে যাওয়া আমাদের জন্য হয়তো এক ধরনের ধৃষ্টতা। তবু তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে আমাদের শিক্ষার অনেক কিছুই নেয়ার রয়েছে বলে তাঁকে নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের একটি বড় অংশই ছিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ। একজন উঁচুমানের সম্পাদক-সাংবাদিক-লেখকের মতোই তিনি নিজে ডায়েরি লিখতেন। ১৯৭৩ সালের ৩০ মে, তখন তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ওই সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নোটবুকে লিখেছিলেন: 'As a man, what concerns mankind concerns me, As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, which gives meaning to my politics and to my very having'-'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'।[২]

তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, ' তাঁর বিশাল রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে তাঁর লেখনীর ভাষায় আমরা পাই। তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সবই সরল-সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়ে যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাদের সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেবে। গবেষক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এ গ্রন্থ মূল্যবান তথ্য ও সত্য তুলে ধরবে'। এ আত্মজীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের আধুনিক একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্বপ্ন, শ্রম ও সাধনা সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছে।

সংবাদপত্রের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সংযোগ ও সম্পর্ক ছিল তাঁর ছোটবেলা থেকেই। তিনি লিখেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ*, মাসিক *মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম।[৩] তবে বঙ্গবন্ধু যেভাবে সংবাদপত্রের মানুষ ছিলেন এবং সংবাদপত্র ও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি কেমন ছিল তা বুঝতে হলে ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত আগের ও পরের সময়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দৈনিক আজাদ ১৯৩৬ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় । ওই সময় ঢাকা থেকে কোনো দৈনিক পত্রিকা বের হতো না। রাজনীতি ও সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তখন কীভাবে জড়িত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষ্যেই তা ফুটে উঠেছে যা এদেশের রাজনৈতিক এবং একই সঙ্গে সাংবাদিকতার ইতিহাসেরই এক অনবদ্য দলিল। তিনি লিখেছেন –

'দৈনিক আজাদই ছিল একমাত্র বাংলা খবরের কাগজ, যা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি আবুল হাশিমকে দেখতে পারতেন না। আবুল হাশিম সাহেবকে শহীদ সাহেব সমর্থন করতেন বলে মওলানা সাহেব তার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমাদেরও ঐ একই দশা। তাই আমাদের কোনো সংবাদ সহজে ছাপা হতো না। মাঝে-মাঝে জনাব মোদাব্বের সাহেবের মারফতে কিছু সংবাদ উঠত। পরে সিরাজুদ্দীন হোসেন (বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাক-এর বার্তা সম্পাদক) এবং আরও দু'-একজন বন্ধু আজাদ অফিসে চাকরি করত। তারা ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটা সংবাদ ছাপাত। দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর কথা বাদই দিলাম। ঐ পত্রিকা যদিও পাকিস্তান আন্দোলনকে পুরাপুরি সমর্থন করত, তবু ওটা একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল, যাদের শোষক-শ্রেণি বলা যায়। আমাদের সংবাদ দিতেই চাইত না। ঐ পত্রিকা হাশিম সাহেবকে মোটেই পছন্দ করত না। ছাত্র ও লীগ কর্মীরা হাশিম সাহেবকে সমর্থন করত, তাই বাধ্য হয়ে মাঝে-মাঝে সংবাদ দিত। আমরা বুঝতে পারলাম, অন্ততপক্ষে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ হলেও আমাদের বের করতে হবে, বিশেষ করে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবধারা প্রচার করার জন্য। হাশিম সাহেবের পক্ষে কাগজ বের করা কষ্টকর। কারণ, টাকাপয়সার অভাব। শহীদ সাহেব হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেছেন। তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন, ভাল ব্যারিষ্টার হিসেবে কলকাতায় নামও ছিল। ..হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন কাগজটা প্রকাশ করতে এবং বললেন যে, একবার যে খরচ লাগে তা পেলে পরে আর যোগাড় করতে অসুবিধা হবে না। নুরুদ্দিন ও আমি এই দুইজনই শহীদ সাহেবকে রাজি করাতে পারব, এই ধারণা অনেকেরই ছিল।

আমরা দুইজন একদিন সময় ঠিক করে তাঁর সাথে দেখা করতে যাই এবং বুঝিয়ে বলি বেশি টাকা লাগবে না, কারণ সাপ্তাহিক কাগজ। আমাদের মধ্যে ভাল ভাল লেখার হাত আছে, যারা সামান্য হাত খরচ পেলেই কাজ করবে। অনেককে কিছু না দিলেও চলবে। আরও দু'-একবার দেখা করার পরে শহীদ সাহেব রাজি হলেন।

মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায় অনেক ঘর খালি ছিল। তাই জায়গার অসুবিধা হবে না। হাশিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হল। আমরা অনেক কর্মীই রাস্তায় হকারী করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবই কাগজের লেখাপড়ার ভার নিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। ব্যবহারও অমায়িক ছিল। সমস্ত বাংলাদেশেই আমাদের প্রতিনিধি ছিল। তারা কাগজ চালাতে শুরু করল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। এর নাম ছিল 'মিল্লাত'।[৪] উল্লেখ্য, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তিনি এখানে শহীদ সাহেব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এভাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর সময় ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করছিলেন। তারও আগে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তান আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের সমর্থক 'দৈনিক আজাদ' তাঁর জীবনে কী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা:

'আমার কাছে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ থাকত। আর হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেবের 'পাকিস্তান' বইটা এবং মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেবও 'পাকিস্তান' নামে একটা বিস্তৃত বই লিখেছিলেন সেটা;এই দুইটা বই আমার প্রায় মুখস্থের মত ছিল। আজাদের কাটিংও আমার ব্যাগে থাকত।[৫]

সমকালীন সম্পাদক, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সাথে তিনি বলতে গেলে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী এবং সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য–এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনের সাথে বঙ্গবন্ধু ও এসব নেতার যোগসূত্র বাংলাদেশের

ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ভেতরের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সবিশেষ ওয়াকিবহাল। এর ফলশ্রুতিতেই স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে যে ভাষণ দেন সেখানে তাঁর সুচিন্তিত ও আবেগঘন বক্তব্য সাংবাদিক সমাজের জন্য আজও এক বিরাট দিকনির্দেশনা হয়ে রয়েছে।

এ সম্পর্কে সাংবাদিক বেবী মওদুদ আরও লিখেছেন: 'কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় থেকে সংবাদপত্র অফিসে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। কলকাতার দৈনিক আজাদ অফিসে সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে তিনি আড্ডা দিতেন। অনেক সময় মুসলিম লীগের প্রেস রিলিজ নিয়েও যেতে হতো তাঁকে। এ সময় তাঁর উপলব্ধিতে আসে যে, মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে সমর্থন করে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরা শহীদ সোহরাওয়াদীর অর্থানুকূল্যে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' প্রকাশ করেন। সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ। পত্রিকাটি সেই সময়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে একটি আধুনিক পত্রিকা হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রিকা বিক্রির কাজে শেখ মুজিব নিজে পরিশ্রম করেন। পত্রিকার ভালোমন্দ এবং ব্যবস্থাপনার কাজেও তিনি একজন দায়িত্বশীল পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাকিস্তান হবার পরও পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। শেখ মুজিব পত্রিকার ঢাকার অফিসে সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন এবং পূর্ববাংলায় এর এজেন্ট নিয়োগ করে এর ব্যাপক প্রচার কাজ করেছেন। একসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বলে এই পত্রিকার পূর্ব বাংলা'য় প্রচার বন্ধ করে দেয় খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার'।[৬]

এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেও লিখেছেন: ...হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হতে চাইলেন। কারণ, মওলানা আকরম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করেছিলেন। শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। হাশিম সাহেব রাগ করে লীগ সেক্রেটারির পদ থেকে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা আসতেন 'মিল্লাত' প্রেসেই থাকতেন।

... সে অনেক কথা। তিনি কলকাতা আসলেই শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। এর প্রধান কারণ ছিল *মিল্লাত* কাগজকে দৈনিক করতে সাহায্য না করে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ কাগজ বের করেছিলেন-নবাবজাদা হাসান আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনা এবং আবুল মনসুর সাহেবের সম্পাদনায়। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দৈনিক *আজাদ*ও ক্ষেপে গিয়েছিল শহীদ সাহেবের ওপর। কারণ, পূর্বে একমাত্র *আজাদ* ছিল মুসলমানদের দৈনিক। এখন আর একটা বের হওয়াতে মওলানা সাহেব যতটা নন, তাঁর দলবল খুব বেশি রাগ করেছিল।[৭]

দৈনিকটির 'ম্যানেজার' ছিলেন নবাবজাদা হাসান আলী এবং 'সেক্রেটারি' পদে দায়িত্বে ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন: মানিক ভাই তখন কলকাতায় *ইত্তেহাদ* কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের টাকাপয়সার খুবই প্রয়োজন। কে দিবে? বাড়ি থেকে নিজেদের লেখাপড়ার খরচটা কোনোমতে আনতে পারি, কিন্তু রাজনীতি করার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? আমার একটু সচ্ছল অবস্থা ছিল, কারণ *ইত্তেহাদ* কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম। মাসে প্রায় তিনশত টাকা পেতাম। আমার কাজ ছিল এজেন্সীগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করা, *ইত্তেহাদ* কাগজ যাতে চলে এবং নতুন এজেন্ট বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা যায় সেটা দেখা।[৮]

এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বঙ্গবন্ধুসহ অন্যরা ঢাকা'য় চলে আসেন। তখনো রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় *ইত্তেহাদ*-এর প্রভাব বজায় ছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

আমি ঢাকা'য় এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বইপুস্তক কিছু কিনলাম। ঢাকা'য় এসে শুনলাম গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সভা হয়ে গেছে। কার্যকরী কমিটির নতুন সভ্য কোঅপ্ট করা হয়েছে। পূর্বে ছিলাম সতের জন এখন হয়েছে চৌত্রিশ জন। কারণ, আমাদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র। আমাদের অনেকে নোটিশও পায় নাই। অন্য কোনো কাগজ না ছাপলেও কলকাতার *ইত্তেহাদ* কাগজ আমাদের সংবাদ ছাপত। *ইত্তেহাদেও* নোটিশ ছাপানো হয় নাই। আমি আপত্তি তুললাম এবং বললাম, সতের জন সদস্য, কেমন করে আরও সতের জন কো-অপ্ট করতে পারে? সভা ডাকা হোক।[৯]

ভারত ভাগ হয়ে সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনজীবনে নতুন করে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হলো তার অনেক চিত্রই ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষ্যে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচ্ছত্র ক্ষমতার দাপটে তখন বাঙালিদের জীবনে নতুন যে শঙ্কা ও সঙ্কট দেখা দিল। দেশের সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, শুধু নিজের বা নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য নয়। তাঁর চিন্তা সমগ্র দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে। তাঁর লেখায় সেই সঙ্কটের চিত্র বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

...স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে। খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনাবিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচি। সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলা'য় কিছু নাই। আব্বাকে সকল কিছুই বললাম। আব্বা বললেন, 'আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি বিবাহ করেছ, তোমার মেয়ে হয়েছে, তাদের জন্য তো কিছু একটা করা দরকার।' আমি আব্বাকে বললাম, 'আপনি তো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু না করতে পারি, বাড়ি চলে আসব। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না।' আমাকে আর কিছুই বললেন না।

আমি ঢাকায় রওয়ানা হয়ে আসলাম।.. *ইত্তেহাদের* কাজটা আমার ছিল। মাঝে-মাঝে কিছু টাকা পেতাম। যদিও *ইত্তেহাদের* অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব বাংলা সরকার প্রায় ব্যান্ড করে দিয়েছিল। এজেন্টরা টাকা দেয় না। পূর্ব বাংলায় কাগজ যদিও বেশি চলত।[১০]

সংবাদপত্রের অবস্থার সাথে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবস্থা তখন একই সূত্রে গাঁথা। ওই সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও *ইত্তেহাদের* অবস্থার সাথে শেখ মুজিবের কী অবস্থা চলছিল তাও ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর লেখনীতে:.. জেলায়

সাংবাদিক বেবী মওদুদ আরও লিখেছেন: 'কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় থেকে সংবাদপত্র অফিসে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। কলকাতার দৈনিক আজাদ অফিসে সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে তিনি আড্ডা দিতেন। অনেক সময় মুসলিম লীগের প্রেস রিলিজ নিয়েও যেতে হতো তাঁকে। এ সময় তাঁর উপলব্ধিতে আসে যে, মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে সমর্থন করে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরা শহীদ সোহরাওয়াদীর অর্থানুকূল্যে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' প্রকাশ করেন।

জেলায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থকরা আওয়ামী লীগে যোগদান করতে শুরু করল। এই সময় কলকাতায় *ইত্তেহাদ* কাগজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতা ত্যাগ করে করাচি চলে গিয়েছেন। মানিক ভাই ঢাকা এসেছেন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তিনিও এসে মোগলটুলিতে উঠেছেন।[১১]

তৎকালীন সংবাদপত্র ও রাজনীতির সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবন যে কীভাবে জড়িয়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথাতেই তা এভাবেই ফুটে উঠেছে। ঘটনাবলির গভীরে গিয়ে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এদেশের মানুষের রাজনীতি ও সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতা তখন একই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববাংলা'র মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সেই রাজনীতি ও সাংবাদিকতা একে অপরকে পথ দেখিয়েছে। আর সেই পথের যাত্রী মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁর দুই ভাবশিষ্য তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমান। এক্ষেত্রে মানিক মিয়া সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার:

মানিক মিয়া ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংকশনসহ বিএ পাস করে পিরোজপুর সিভিল কোর্টে কর্মরতকালে একবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। ..কিছুকাল পর সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে মানিক মিয়া সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং তিনি মানিক মিয়াকে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। এইখানেই উপমহাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সাথে তফাজ্জল হোসেনের পরিচয় ঘটে। ..এ সময় তিনি *ইত্তেহাদ*-এর পরিচালনা বিভাগে সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। '

সাংবাদিকতার সঙ্গে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্কের সূত্রপাত 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর মাধ্যমে। আর এখানেই তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনার হাতেখড়ি। বাংলা তথা পাক-ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে তার একটা স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল আর এই জ্ঞানই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) আপামর জনসাধারণের দরদি শক্তিশালী নিবন্ধকার 'মোসাফির'-এর জন্ম দেয়।

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং সেই বছরই এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশিত হয়। মওলানা ভাসানী তখন এই পত্রিকার আনুষ্ঠানিক সম্পাদক। তফাজ্জল হোসেন ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুসলিম লীগ আমলে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মানিক মিয়া ১৯৫৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় 'দৈনিক ইত্তেফাক' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি স্বয়ং এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে ভরাডুবি হয় এর মূলে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ভূমিকা এবং 'মোসাফির'-এর কালজয়ী লেখনী।[১২]

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলে একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিকের কী চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত এ যে তারই এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় একজন বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সে রাজনীতির সবটারই লক্ষ্য ছিল এদেশের মাটি ও মানুষ। আজকের দিনের মতো টেবিলে বসে আলোচনা বা খোশগল্প করে, বক্তৃতা দিয়ে, রিসোর্সপারসন বা সম্মানীত অতিথি হিসেবে সম্মানী নেয়ার মতো বুদ্ধিজীবী হওয়ার অবস্থা তাঁদের ছিল না।

বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়া দু'জনে ছিলেন সত্যিকার অর্থেই গণমুখী। আর এই গণমুখিতার জন্য তাঁদের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হয় তা তাঁরা জীবনের সাথী করে নিয়েছিলেন। এভাবে বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়ার মতো রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা ত্যাগী জীবন বেছে নিয়েছিলেন বলেই তাঁদের লেখনীতে প্রথমে স্বাধিকার ও পরবর্তীতে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাঙালি জাতি। তাই মানিক মিয়ার মৃত্যুসংবাদে বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাঁদের সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর উপলব্ধির জন্য এক বিরাট নির্দেশনা যাতে বাংলাদেশের গণমুখী বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। মানিক মিয়াকে লেখা বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী লেখাটিতে উঠে এসেছে আর এক যথার্থ সম্পাদক-সাংবাদিকের প্রতিকৃতি, *দৈনিক ইত্তেফাকের* ইতিহাস তৎকালীন সাংবাদিকতার ইতিহাস-

'গভীর রাত। পিণ্ডি থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম, মানিক ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। মনে হলো চারদিক যেন ভয়ানক ফিকা, শূন্য, একেবারেই অন্ধকার। দাউ দাউ করে জ্বলছিল যেন এক মশাল, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় চারপাশ ঝলমল, নাট্যশালার মহাসমারোহ; সব থেমে গেল।

এ যেন মূহুর্তের অনুভূতি। একটি সংবাদ, একটি বার্তা, মাত্র একটি ঘটনা যে কতবড় হৃদয়বিদারক হতে পারে, কত বেশি মর্মান্তিক হতে পারে, তারই প্রমাণ।

পর মুহূর্তে আমার মানসে ফুটে উঠল দূর অতীত। ১৯৪৩ সন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে কলকাতায় তাঁর সাথে আমার পরিচয়। একই নেতার দুই শিষ্য, যেন একই পিতার দুই সন্তান। বিগত ২৫ বছরের মধ্যে কোনোদিনই আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি, কোনো ঘটনা আমাদের মধ্যে বিভেদ টানতে পারেনি। নেতা মারা যাবার পরও আমরা এক ও অভিন্ন ছিলাম। বর্ষার মেঘরাজির ন্যায় তাঁর অপার স্নেহ আমাকে ঘিরে থাকত। বিশাল বারিধির ন্যায় তাঁর প্রশান্ত বিপুল বক্ষে আমার ঠাঁই হয়েছিল। কোনো ষড়যন্ত্র, কানকথা, নিন্দাবাক্য সেখান থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আবেগমিশ্রিত, হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির রসে সিক্ত। মানিক ভাইর ভালোবাসার কথা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

আজ মানিক ভাই সম্পর্কে লিখতে বসে আমার কলম বারবার থেমে যাচ্ছে, আমার ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, হয়তো ভাববার ক্ষমতাও, তবু মানিক ভাই সম্পর্কে আমার যেটা ব্যক্তিগত অনুভূতি, তা আমি প্রকাশ করব।

মানিক ভাইয়ের কর্মময় জীবনের পরিধি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর সাথে আমার ২৫ বছরের পরিচয়ের ইতিহাস এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আলোড়ন-আন্দোলন, অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মানিক ভাইয়ের আসন দর্শকের গ্যালারিতে ছিল না। দূরত্ব বজায় রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে আরাম-আয়েশ ভোগ করেননি; বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। নিজ জীবনের ঝুঁকি এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের মারগুলো মাথায় পেতে নিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ত্যাগব্রতী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিমূর্ত দেশপ্রেমিকতা, স্বাদেশিকতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। গণশক্তির ওপর তাঁর ছিল প্রগাঢ় আস্থা। নিয়মতান্ত্রিক গণ-অভ্যুত্থানকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবনে খলদুন ও রুশোর প্রকৃতি দত্ত মানবস্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের জাগ্রত চিন্তাবাহী, লিংকনের Government of the people, by the people and for the people-এর পূজারি, প্রকৃতি প্রদত্ত বৈচিত্র্য মেনে নিয়ে ' সব মানুষ সমান'-এই তত্ত্ববাদে বিশ্বাসী। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। একান্ত কঠিন ও নিতান্ত অনমনীয়। পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় অটল। কায়েমি স্বার্থের নিক্ষিপ্ত শরগুলো তাঁর বক্ষে এসে ভেঙে ভেঙে পড়েছে। 'ইত্তেফাক' বারবার বন্ধ হয়ে গেছে। রোগাক্রান্ত হয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছেন। তবু আপস করেননি।

মানিক ভাই ছিলেন কর্মবাদী মানুষ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, কাজের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। পদের মাঝে নয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, '৬২-এর গণজাগরণ, '৬৫ সালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৯৬৬ সাল ও তার পরবর্তীকালের স্বায়ত্তশাসন কায়েমের গণঅভ্যুত্থানে মানিক ভাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কর্মী ও নেতাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। লেখনীর দ্বারা আমাদের দাবি-দাওয়াকে জনগণের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। নিজের জন্য কোনদিন তিনি কিছু চাননি। একটু ইঙ্গিত করলে, সামান্য আভাস দিলে, একটু পটপরিবর্তন করলে প্রভূত ঐশ্বর্য মানিক ভাইর পায়ের কাছে এসে জমা হতো। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর একবার আমি নিজে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, মানিক ভাই হেসে বলেছিলেন, 'সংগঠন আপনাদের, কলম আমার'। প্রত্যাখ্যানের কী অপূর্ব সুন্দর পদ্ধতি। ১৯৫৫ সালে তাঁকে গণপরিষদের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি সেদিনও তা গ্রহণ করেননি। আমার জানা আছে, আইয়ুব শাস-নামলে তাঁকে বহুবার উচ্চ পদমর্যাদার প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিছু না চেয়ে দেবার যে প্রেরণা মানুষকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দান করে, মানিক ভাইয়ের মধ্যে সেই তাগিদ ছিল একান্ত আন্তরিক।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি 'ইত্তেফাক' দাঁড় করিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের অসহযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা ইত্তেফাকের যাত্রাপথে কণ্টক হয়ে দেখা দিয়েছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল আরেকটি বড় বাধা। তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য করবার ক্ষমতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। একমাত্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারাই তিনি 'ইত্তেফাক' বাঁচিয়ে রেখেছেন। নিজের কর্ম দ্বারা বড় হয়েছেন। উপর থেকে কেউ তাঁকে টেনে তুলেননি।

বাংলা'র সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন মানিক ভাই। কলামিস্ট হিসেবে খোদাপ্রদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। সমস্যা-সচেতনতা, বাস্তবাশ্রিত আবেগ-অনুভূতির তীব্রতা, ভাষার সাবলীল গতি, বোধগম্যতা, যুক্তি-আশ্রয়ী মননশীলতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। শক্ত বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করার ভাষা-চাতুর্য তিনি রপ্ত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের নির্ভীকতা ও সততা তাঁর রচনাগুলোকে প্রভাবিত করেছে। জীবনের ন্যায় লেখার মধ্যেও তিনি কোনোদিন মিথ্যার প্রশ্রয় দেননি।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণমুখী। জনগণের কথা বলার জন্যই তিনি লেখনী হাতে নিয়েছিলেন। জনগণের ভাষায় তিনি কথা বলতেন। অলঙ্কারের বাহুল্যচমক তাঁর বিষয়বস্তুকে কোনোদিন আবৃত করতে পারেনি। তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন সাংবাদিক ভাষা। কঠিন তাত্ত্বিক আলোচনার মাঝে রসালো গ্রামীণ গল্প ও সর্বজনপরিচিত কাহিনী সংযোগ করে তিনি তাঁর রচনাগুলোতে প্রাণসঞ্চার করতেন।

শব্দ সংগ্রহ ও প্রয়োগে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলো অনেক সময় নিজস্ব আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে নতুন অর্থ ব্যক্ত করত।

তিনি ছিলেন উঁচুদরের গাল্পিক। যেন ক্ষ্যাপা দুর্বাশা। সবসময় যেন বিক্ষুব্ধভাব। আসলে তিনি ছিলেন, ঘোরবিপ্লবী; অন্যায়, অত্যাচার-জালেম-জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বদা খড়্গহস্ত। উৎপীড়ন, নির্যাতনকারীদের প্রতি মারমুখী। অন্তরে তিনি ছিলেন কোমল। ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা জারক রসে তাঁর মন ছিল সিক্ত। মানিক ভাই ভালোবাসতে জানতেন। প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন বাংলাদেশ'কে। এদেশের মাটিকে, মানুষকে। তারুণ্যের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব। তরুণ রাজনৈতিক কর্মী ও নির্যাতনভোগীদের প্রতি তাঁর ছিল অন্তরের অশেষ দরদ। শেষের দিককার লেখাগুলোকে একেবারে নিজেকে উজাড় করে তিনি ধরা দিয়েছিলেন এঁদের কাছে।

.. সামান্য আসবাবে সজ্জিত ছিল 'ইত্তেফাক' অফিসে তাঁর ব্যক্তিগত বসবার ঘরখানি। একখানা মাত্র ডেকচেয়ার; সহযোগীদের জন্য অতি সাধারণ টেবিল, ক'খানা চেয়ার, একটা বইয়ের আলমারি। সেদিন পর্যন্ত পুরাতন একখানা ভাঙ্গা হিলম্যান গাড়ি ব্যবহার করেছেন মানিক ভাই। ভাঙ্গা নড়বড়ে। মাঝপথে সেটা বন্ধ হয়ে যেত। তবু মানিক ভাই পাল্টাতে চাননি, বুড়ো ড্রাইভার ও পুরাতন গাড়ি তাঁকে পেয়ে বসেছিল। শুনেছি, ছেলেমেয়েরা অনেক কষ্টে শেষতক সেটাকে বিদায় করতে সক্ষম হয়েছিল।

সর্বোপরি মানিক ভাইকে আমরা পেয়েছি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে। মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনের পথে যে মশালধারী বীর সেনানীরা আপন জীবনের স্বাক্ষর রেখে যায় ইতিহাসের পাতায়, মানিক ভাই তাঁদেরই একজন। এদেশের সত্যিকারের ইতিহাস যদি কোনোদিন লেখা হয়, তাহলে সেখানে মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তাঁর সত্য আসনটি পাবেন ও অমর-অক্ষয় এক প্রজ্বলিত জ্যোতিষ্কের ন্যায় সেখানে বিরাজ করবেন।

ধন্য বাঙালি জাতি, যে তাঁকে বক্ষে ধারণ করেছিল। ধন্য বাংলার সাংবাদিক পরিমণ্ডল, যে তাঁকে নিজেদের জগতে পেয়েছিল। ধন্য আমরা সকলে যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম।

চিরবিশ্রামে শায়িত মানিক ভাইর স্মৃতির প্রতি এটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।[১৩]

১৯৭২ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেয়া ভাষণটি সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর সাহসী ও আন্তরিকতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কথায় বলে, 'সরিষায় ভূত! সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ানো হয়। আর সে যদি সরিষার মধ্যেই ভূত থাকে সেই সরিয়া দিয়ে কি হবে? বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজের একটি অংশের মধ্যে যে ভূত রয়ে গেছে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তা ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো দেখা যায়, ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সেদিন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে ভূত সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ:

'আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই।

.. গণতন্ত্রের একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমন একটা মূল নীতি আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যাঁরা সামরিক চক্রের হীনকাজে সহায়তা করেছেন। তাঁরাই ধরিয়ে দিচ্ছেন সেই সাংবাদিকদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোন দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি আলবদরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাঁদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তারা হানাদার বাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর আঘাত করা **হবে?**

.. আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আর্দশ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলা'র বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখন থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন, না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে কখনো ছিল না।

..সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ২৪টি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলা'র মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের

66

১৯৭২ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেয়া ভাষণটি সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর সাহসী ও আন্তরিকতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কথায় বলে, 'সরিষায় ভূত! সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ানো হয়। আর সে যদি সরিষার মধ্যেই ভূত থাকে সেই সরিয়া দিয়ে কি হবে? বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজের একটি অংশের মধ্যে যে ভূত রয়ে গেছে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তা ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন।

99

ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন, তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

..স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। ..কোন কোন কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব এবং ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল ল' জারি করা হয়েছিল এবং আমাকে বন্দী করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই। আবার এরাই এখন লেখেন, চালের দাম একশ' বিশ টাকা।.. চালের দাম বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

আমি আরও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচিতে আর দেখেছি পিন্ডিতে। এটা হলো ভীতি প্রদর্শন। কোন সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিকে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো টাকা দাও, নইলে তোমার বিরুদ্ধে লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যি টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ্য করছি এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? .. আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশিরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সহযোগিতা করব।..আপনারা সাত কোটি লোকের একটা অংশ। তাছাড়া গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারব।'[১৪]

প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং সম্পাদক বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৭-১৯৭৬) সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক কেমন ছিল তা আঁচ করা যায় তাঁরই সন্তান বাংলাদেশ টাইমসের এককালীন সাংবাদিক মহবুব আনামের একটি লেখা থেকে–

'শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' প্রথম বের হয় তেয়াত্তরের মাঝামাঝি। তখনকার একদিনের অভিজ্ঞতার ফসল এটা। মরহুমের পুত্র হিসেবে আমাকে অনেক রাজনৈতিক ও অন্যান্য মিশনে যেতে হতো। একদিন আমাকে বইটির একটি কপি দিয়ে আব্বা বললেন যে, এটা তুমি স্বয়ং 'মুজিবকে দিয়ে এসো'। সেসময় জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। আমি সোজা চলে গেলাম রফিকুল্লা চৌধুরীর কাছে। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিব। এককালে সলিমুল্লা মুসলিম হলে আমারই ক্যাবিনেট কলিগ। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'বস্ যে, কি ব্যাপার? আমি বললাম: আপনার বর্তমান 'বসের' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। চৌধুরী বললেন, আপনাকে আমার মাধ্যমে যেতে হবে না।-সোজা চলে যান তাঁর কক্ষে।' কথামতো প্রধানমন্ত্রীর কামরায় সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়লাম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আসনে ছিলেন না। চৌধুরী আমাকে আগেই বলেছিল যে, 'খাস কামরায় না-ও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পাশেই আর একটি ছোট্ট শয্যাবিশিষ্ট কামরা আছে সেখানে নির্ঘাত পাওয়া যাবে।' গেলও তাই । তিনি শুয়ে শুয়ে মাইক্রোফোন মাধ্যমে সংসদের বিতর্ক শুনছিলেন।

আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী শোয়া থেকে উঠে স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনার সুরে প্রশ্নের তুফান ছুটিয়ে বললেন,: ''কিরে মহবুব যে! হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে? মনসুর ভাই কেমন আছেন? বোস বোস–হাতে এটা কি?"

আমি বললাম, '' আব্বার সর্বশেষ বই–ওটা দিতেই তো আসা। আব্বা বললেন, আপনাকে নিজ হাতে এটা পৌঁছে দিতে।"

'দেখি, দেখি আরে মনসুর ভাইয়ের লেখা। আমি তো তারই শিষ্য। এ বইয়ে দেখছি তিনি আমাকে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন। এ যে আমার জন্য কতবড় সম্মান সেটা তাঁকে বলিস। সকলের বলা এক কথা–আর মনসুর ভাইয়ের কলমে বের হওয়ার আলাদা সম্মান।"

আমি চুপ করে থাকলাম। বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যে বইটি খুলে পড়া শুরু করেছেন। পড়ছেন আর মন্তব্য করে চলেছেন।

''আহা! কি সুন্দর তাঁর ভাষা। তিনি পায়ের আঙুলের ফাঁকে কলম রেখে যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম–অন্যরা দু'হাতে কলম ধরেও অতো সুন্দর লিখতে সক্ষম হবে না।''

'তুই আমার তরফ থেকে তাঁকে একটা অনুরোধ জানাবি। তিনি ২১ দফার স্রষ্টা ৬ দফার রচয়িতা। তাঁকে বলিস বাংলাদেশের চার মূলনীতির ওপর, যেটাকে সকলে মুজিববাদ বলে, ... ওর ওপর একটা বই লিখতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনসুর ভাই লিখলে সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট হবে। কিরে বলবি তো? তিনি কি আমার কথা রাখবেন?" আমি বললাম: নিশ্চয় তিনি আপনার কথা রাখবেন। আমি বলবো। '

'তা তুই কি করছিস? তুই কি রাজনীতিতে আসবি না। মনসুর ভাইয়ের ট্র্যাডিশনটা তোরা কি কেউ রাখবি না। যদি রাজি থাকিস তবে তোকে বিদেশে পাঠাতে পারি।"–বঙ্গবন্ধু বলেই চলেছেন বইটি পড়তে পড়তে। আমি বললাম: "আব্বাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়"।

–তুই কি ভাবছিস আমি তোকে একা যেতে বলেছি? মনসুর ভাইকেও আমি সরকারি খরচে বিদেশে পাঠাচ্ছি। যদি রাজি থাকে তবে বলিস। বল্লেন বঙ্গবন্ধু। এ সময়ের মধ্যে মন্ত্রী বা অন্য কাউকে আসতে দেননি। একবার সেরনিয়াবাত সাহেব, আর একবার তোফায়েল আহমদ সাহেবকে শুধু ২/১ মিনিটের জন্য ভেতরে আসার অনুমতি দেন।[১৫]

সংবাদপত্র প্রকাশনা, পরিচালনা, জনসংযোগ, এর জন্য বিজ্ঞাপন সরবরাহ, লেখালেখি থেকে শুরু করে এ জাতীয় সব কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলেই সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন এবং একই সঙ্গে সাংবাদিকদের জীবন-মানের কথাও বঙ্গবন্ধু সবসময় মনে রাখতেন। কর্মরত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ১৯৭৪ সালে ন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং এর জন্য প্রাথমিকভাবে মন্ত্রিসভায় ১৫ লাখ টাকা অনুমোদন করেন।[১৬] সমগ্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরই যিনি জনক, সংবাদপত্র জগৎ তার একটি অঙ্গ এবং এই অঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই জগতের একজন হয়েও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর তাঁর সঙ্গে এবং একই সঙ্গে একটি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে যে আচরণটি করা হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ এ জাতি কখনো করতে পারবে কি-না তা হয়তো ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। আজ শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির অন্য সকল অর্জনের মতো সংবাদপত্র জগতের অর্জনও বঙ্গবন্ধুর রক্তের কাছে চিরঋণী। কেননা, তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বলেই এদেশের সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম জগৎ আজকের অবস্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড ৬,পৃ.-৩৩৬
২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী,তৃতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
৩. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.-১০
৪. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.-৪০
৫. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.-২২
৬. *নিরীক্ষা*, ১৯৬ তম সংখ্যা, পৃ.১৪-১৫, জুলাই-আগস্ট ২০১৩
৭. অসমাপ্ত আত্মজীবনী শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ.৭২
৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮
৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭
১০. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬
১১. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৯
১২. গ্রন্থকার পরিচিতি,*পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সম্পাদক: আবদুল হাফিজ, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪
১৩. *বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৪, ঢাকা, পৃ.১৫-২১
১৪. *বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৪, ঢাকা, পৃ.১৫-২১
১৫. মহবুব আনাম, দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাপারে দু'টি কথা, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ. ৫-৭
১৬. দৈনিক সংবাদ, ২৪মে ১৯৭৪।

লেখক: রিসার্চ অফিসার, পিআইবি

বাড়ির নাম
বত্রিশ নম্বর

মো. কবির হোসেন কাব্য

লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট বলতে বিশ্ববাসী জানেন, এটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। তেমনি ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি বলতে বোঝায় একটি ইতিহাস, একটি তীর্থ ক্ষেত্র। এই বাড়ি থেকেই সূচনা হয় স্বাধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সুতিকাগার বলা যায় এ বাড়িটাকে। বর্তমানে দেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল অনুষ্ঠান শুরু হয় এই বাড়িতে স্থাপিত জাতির জনক এর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণের মধ্যদিয়ে। ধানমণ্ডির পুরনো ৩২ নম্বর সড়কের এই বাড়ি বলতেই বুঝতে পারে সবাই, এটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন। বাড়িটির সঙ্গে বাঙালির এত ঘটনা, এত স্মৃতি ও এত ইতিহাস বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে, সড়কের নম্বরই ৬৭৭ নম্বর বাড়ির নাম হয়ে গেছে। কেউ আর বাড়ির নম্বর খোঁজে না। শুধু ৩২ নম্বর বললেই সবাই বুঝে যায়, এটিই সেই বাড়িটি। ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের সামগ্রিক

পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি পরিচালিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক বাড়িটি থেকেই। বাংলাদেশকে মুক্ত করার সিদ্ধান্তও হয়েছিল এই বাসভবনেই।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে ওঠেন। বাড়িটি দোতলা পর্যন্ত তৈরি হতে কয়েক বছর লেগেছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার একটি লেখায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'যখন এ বাড়িতে এসে উঠি, তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে অক্টোবরে রাসেলের জন্ম। তখনও বাড়ির দোতলা হয়নি, নিচতলাটা হয়েছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িগুলো তখনও প্ল্যাস্টার হয়নি। মা খুব ধীরে টাকা জমিয়ে এবং হাউস বিল্ডিংয়ের লোনের টাকা নিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। কাজেই অত্যন্ত কষ্ট করেই মাকে এই বাড়িটা করতে হয়েছে। আব্বা মাঝে-মাঝেই জেলে যেতেন বলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত, যে কারণে এ বাড়ি শেষ করতে বহুদিন লেগেছিল। ১৯৬১ সালে এই বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কোনোমতে তিনটা কামরা করে আমরা এসে উঠি। এরপর মা একটা একটা কামরা বাড়াতে থাকেন। এভাবে ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে দোতলা শেষ হয়।'

দোতলা সম্পন্ন হলেও বাড়িটি ছিল অসম্পূর্ণ তিন তলার। খুবই সাধারণ কাঠামোর বাড়ি এটি। বঙ্গবন্ধু ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এই বাড়ি থেকেই। আন্দোলনের নির্দেশনা এই বাড়ি থেকে দেওয়া হতো। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়েই এই বাড়িটি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রথম। ১৯৬২ সালে এই বাড়ি থেকে গ্রেফতারও হন তিনি।

১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৩২ নম্বরের এই বাড়িতে বহু মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্যস্ত মানুষের মনে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের সাক্ষ্য হয়ে আছে এই বাড়িটি। সে সময় শেখ মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এই বাড়ি থেকে।

ছেষট্টির ৬-দফা আন্দোলনের কার্যক্রম সংগঠিত হয় এখান থেকে। এ সময় তিনি এ বাড়ি থেকেই গ্রেফতার হন। ছেষট্টির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পর্যন্ত এ বাড়িটি অনেক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী বহন করে। এর সমর্থন পাওয়া যাবে শেখ হাসিনার লেখায়। জানা যায়, ৬-দফা দেওয়ার পর উচ্চ ও মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের পদচারণা বেড়ে যায় এই বাড়িতে। নিচতলা তখন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কার্যালয় হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা জেলখানা থেকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর ওপর একের পর এক মিথ্যা মামলা। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। গর্জে উঠে বাংলা'র সর্বস্তরের জনসাধারণ। শুরু হয় আন্দোলন। সূচনা হয় গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় ষড়যন্ত্রকারীরা। সেদিন এই বাড়ির সামনে বাংলা'র মানুষের ঢল নেমেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সব শ্রেণির, সব পেশার মানুষ এসে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে

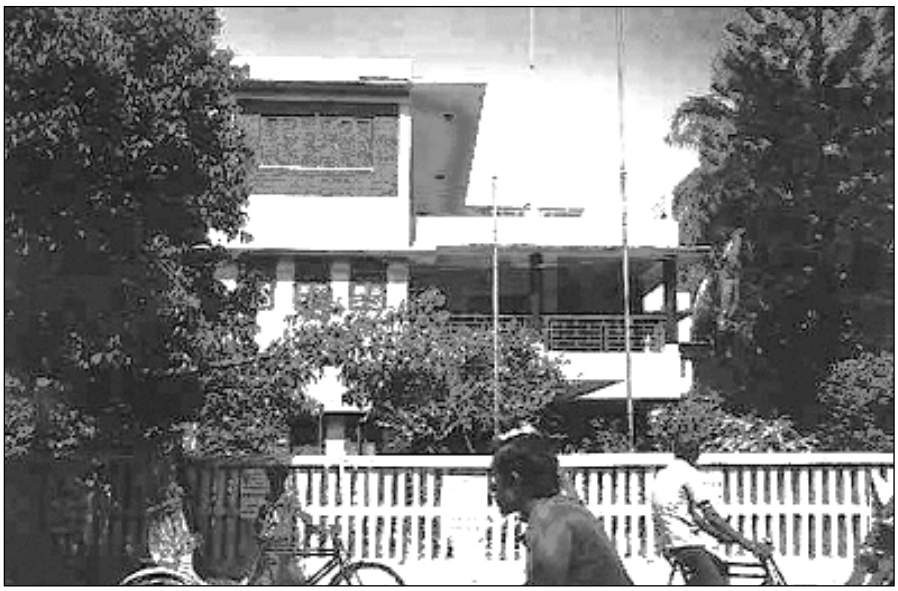

ছবি: ইন্টারনেট

যেত। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হলো পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতারা তার প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের কাছে পৌঁছাল, তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত তখন গভীর, ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা, তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল, ঐ জায়গায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন বাংলা'র প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু। ফিরে এলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় ৩২ নম্বর বাড়িতে। স্বাধীন বাংলাদেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নানামুখী কর্মসূচি হাতে নেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। তিনি শোষিত ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষের জন্য একেবারে ছেলেবেলা থেকে লড়াই করে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু সবসময় চাইতেন, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ও উচ্চাভিলাসী সদস্যের হাতে ৩২ নম্বর বাড়িতে পরিবার-পরিজনসহ নিহত হন বঙ্গবন্ধু। এ হত্যাকণ্ডে ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৮১ সালে ১১ জুন পর্যন্ত বাড়িটি সিল করা ছিল। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার আহবানে ১৯৮১ সালের ১২ জুন বাড়িটি খুলে দেওয়া হয় তৎকালীন সাত্তার সরকারের নির্দেশে। খুলে দেওয়ার পর সাংবাদিকদের বাড়িটি পরিদর্শনের জন্য আনা হয়। শেখ হাসিনা নিজেও বাড়িটি পরিদর্শন করে দেখেন যে, খুনিরা শুধু হত্যাকাণ্ড করেই ক্ষান্ত হয়নি, 'হত্যার পর লুটপাটও করেছে। এই লুটপাট কয়েকদিন ধরে চলেছে। মা, রেহানা ও জামালের ঘরেই লুটপাটের চিহ্ন বেশি। মা'র ঘরের আলমারির সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিছানার উপর ছড়ানো। তোশক-বালিশগুলোর একদিকে বুলেটে ঝাঁঝরা আবার অনেকগুলো বালিশ ছেঁড়া। দীর্ঘদিনের অযত্নের ফলে মাকড়সার জাল, পোকা ও ধুলায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা ও মা'র ঘরের পাশে যে ড্রেসিং রুম, তার আলমারিতে যেসব কাপড় ছিল, সব দলা করে রাখা ও পোকায় খাওয়া। মনে হয় যেন আলমারি খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।' বাড়িটি খুলে দেওয়ার পর, আশির দশকের শুরু থেকে আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে থাকে বাড়িটির বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘর ও পড়ার ঘরটি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার লেখায় বলেছেন, '১৯৮৩ সালে ২১ শে জানুয়ারি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী।'

৩২ নম্বরের এই বাড়িটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্যোক্তা 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।' ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট স্মৃতি জাদুঘরের শুভ উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ ও দেশি বিদেশি সম্মানিত বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুননেসার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ১৯৯৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ট্রাস্টের নামে বাড়িটির দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করেন। তার আগে ১৯৯৪ সালে ১১ এপ্রিল গঠন করা হয়েছিল 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রাস্ট।' জাদুঘরটি খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। কেবল বুধবার বন্ধ থাকে জাদুঘরটি। বাড়িটির নিচতলার দু'টি ও দোতলার চারটি কক্ষকে প্রদর্শনী গ্যালারি করা হয়েছে। নিচতলায় ড্রয়িং রুমটি জাদুঘরের প্রথম প্রদর্শনী গ্যালারি। এই গ্যালারিতে বঙ্গবন্ধুর ১১৪টি আলোকচিত্রের

স্মারকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র হচ্ছে-১৯৪৮ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তোলা ছবি, ১৯৪৯ সালে কারাগার থেকে মুক্তির ছবি, ১৯৫৪ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তোলা ছবি, নিজ পরিবারের সঙ্গে একান্ত মুহূর্তে দুর্লভ ছবি, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ছবি. ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তোলা ছবি ও ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে ছবি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তনের ছবিটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ছবি।

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী রাখা একটি শোকেস রয়েছে এই কক্ষের উত্তর দেয়াল ঘেঁষে। আরো আছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বাংলা ও ইংরেজিতে স্মারক।

বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি ঘরটি ছিল নিচতলার ড্রয়িং রুমের পাশেই। এই ঘরে বসেই তিনি ২৫ শে মার্চ রাত ১২:৩০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে ঘোষণা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। বর্তমানে এই পড়ার ঘরটির নিচতলায় দ্বিতীয় প্রদর্শনী গ্যালারি। গুলিবিদ্ধ কয়টি ছবি টানানো রয়েছে এই প্রদর্শনী গ্যালারিতে। সেগুলো হচ্ছে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি, বঙ্গবন্ধুর একক দু'টি ছবি, বেগম ফজিলাতুননেসার একক দু'টি ছবি, বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমানের একক ছবি, শেখ জামাল ও রোজীর বিয়ের ছবিসহ মোট সাতটি ছবি।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর পড়ার টেবিল, টেবিলের উপর রাখা হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের কপি, টেবিলের একপাশে বঙ্গবন্ধুর বসার চেয়ার ও অন্যপাশে দু'টি চেয়ার। আরো কিছু জিনিস রাখা আছে টেবিলের উপর, যেমন শুকিয়ে যাওয়া ফুল, গুলিবিদ্ধ কয়েকটি বই। কাঠ ও কাচের ৬টি বই রাখার আলমারি রয়েছে পাশেই। কক্ষটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাস্কর্য ও একটি কাঠের নৌকা। টেবিলের পাশেই একটি সেলফ। আর এ সেলফে রাখা আছে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের দেওয়া উপহার পবিত্র কোরআন শরিফ। রয়েছে ১৫ই আগস্টের কালো রাতের গুলির চিহ্নগুলো।

বঙ্গবন্ধুর পড়ার ঘরের প্রদর্শনী গ্যালারিটি বর্তমানে বন্ধ রাখা আছে। তবে প্রথম প্রদর্শনী গ্যালারি থেকে দেখার সুযোগ আছে। প্রথম প্রদর্শনী গ্যালারি থেকে বেরিয়েই পড়বে করিডোর। করিডোরের দুই পাশের দেয়ালে কিছুটা উপরের অংশে ১৮ টি বাঁধানো পোট্রেট। ১৫ই আগস্টের কালো রাতে নিহতদের ছবি এগুলো।

করিডোরে আছে বিরাট একটি বকুল গাছের কারুকাজময় শিকড়। এই শিকড়ে রয়েছে ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের শিল্পীসত্তার পরিচয়। শিকড়টি যেন বৈঠাসহ একটি নৌকার প্রতীক। আর এই প্রতীকের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর মুষ্টিবদ্ধ হাত, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক তর্জনী, জাতীয় মাছ ইলিশের লেজ, যুদ্ধাহত নারী, রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, বন্দুকের বাট, বক প্রভৃতির প্রতীকী ব্যঞ্জনা। ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লাগানো বকুল গাছের শিকড় এটি। করিডোরে আরো রয়েছে বাঘের চামড়ায় মোড়ানো বাঘের মূর্তি এবং একটি আলমারিতে সাজানো কিছু আইন ও ধর্ম বিষয়ক বই।

বাড়ির পেছনে নতুন একটি সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে দোতলায় উঠার জন্য। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই হাতের বামে পড়বে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার কক্ষ। এই কক্ষটি বন্ধ রাখা হয়েছে। এই কক্ষের দরজার পাশেই রাখা আছে রাসেলের ছোট্ট একটি একুরিয়াম ও একটি শোকেস।

দোতলার প্রথম প্রদর্শনী গ্যালারিটি ছিল বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক বসার ঘর। এই কক্ষের একটি আলোকচিত্র খুবই আকর্ষণীয়–পোষা কবুতরের সঙ্গে তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবি। এই ছবিটিতে তার ভেতরকার মমত্ববোধের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এ কক্ষে রয়েছে মোট পাঁচটি আলোকচিত্র। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর একমাস আগে তোলা একটি ছবিও রয়েছে এখানে। রয়েছে পারিবারিক একটি ছবি।

বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের খাবার টেবিল রাখা হয়েছে কক্ষটিতে। বঙ্গবন্ধুর জীবনযাপন যে খুব সহজ-সরল ও সাধারণ ছিল তা বোঝা যায় তার কক্ষের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে।

রাসেলের সাইকেলটিও রয়েছে। আছে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর হাতে বানানো আচারের পাত্র। একটি কোকের বোতল। জানা যায়, রাসেল কোক খেতে চেয়েছিল। তাই ১৪ আগস্ট রাতে কোকটি আনা হয়েছিল। তা আর খাওয়া হয়নি শিশু রাসেলের। কক্ষটিতে তোয়ালে রাখা আছে। আছে কিছু ফুল। বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক কক্ষটিতে এভাবেই রাখা হতো ফুল আর তোয়ালে। ১৫ই আগস্ট এই বাড়িতে যে নারকীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল তার পরিস্থিতি ও পরিবেশ বোঝানোর জন্য ৯টি আলোকচিত্র ক্যাপশনসহ স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনী গ্যালারিতে।

তিনটি বেতের মোড়া ও একটি সাধারণ সোফাসেট রয়েছে বসার এই কক্ষটিতে। পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে একটি টিভি। এই কক্ষের দেয়ালেও আছে বেশকিছু গুলির চিহ্ন। পারিবারিক বসার কক্ষের পাশেই বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষ। এই কক্ষেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বেগম ফজিলাতুননেসা, শেখ জামাল, শেখ কামাল, পুত্রবধূ সুলতানা ও রোজীকে। সেই বুলেটের চিহ্ন এখনো রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শোবার খাট, খাটে বালিশ, কোলবালিশ সাজানো রয়েছে। পাশেই দু'টি কমলা রঙের ফোন। খাটের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রাখা আছে শিশু রাসেলের মাটির ব্যাংক। এছাড়া সিঙ্গেল সোফা, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি ওয়ারড্রোব, একটি স্ট্যান্ড ফ্যান, একটি সিলিং ফ্যান, বঙ্গবন্ধুর গুলিবিদ্ধ ছবি এবং গহনার কিছু খালিবাক্স যার সব গহনা ১৫ই আগস্ট রাতে লুট হয়েছে। একটি চিলমচিও রয়েছে যা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে দেখা যায়। আরো একটি ছবি আছে যেখানে মা বঙ্গবন্ধুকে আদর করছেন।

শোবার ঘরের সঙ্গে একটি বাথরুম। বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘর থেকে বের হলেই চোখে পড়বে ১৫ই আগস্ট ভোররাতে এই বাড়ির সিঁড়িতে ভয়াবহ নির্মমতার হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা।

প্রথমদিকে সিঁড়ির তিন ধাপ নিচে বাংলাদেশের পতাকা বিছানো ছিল। এখানেই পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ। উপর থেকে নিচে নামতে প্রথম যে স্থানটিতে সিঁড়ি বাক নিয়ে নিচে নেমে গেছে সেই বাক-নেওয়া স্থানটির দেয়ালে রয়েছে শিল্পী শাহাবুদ্দীনের আঁকা বঙ্গবন্ধুর একটি রক্তাক্ত পোট্রেট। পাশেই দেয়ালে লেখা রয়েছে, 'অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখো বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘাতকেরা এখানেই হত্যা করেছিল।'

বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরের পাশেই ছিল শেখ রেহানার ঘর। এখানে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিবার-পরিজনের দু'টি আলোকচিত্রসহ মোট ৩৮ টি ব্যবহৃত আলোকচিত্র। ঘরের উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে মাঝখানে কাচ দিয়ে ঘেরা স্থানে রাখা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ডায়েরি (ছোট্ট), পেপারওয়েট, বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত একটি শাল, মুজিব কোট, একটি পাঞ্জাবি, একটি লুঙ্গি, একজোড়া স্যান্ডেল, পাইপ, তামাক, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেসার একটি লোকজ মোটিভ সম্বলিত 'জয় বাংলা' লেখা শাড়ি, একজোড়া স্যান্ডেল, দুই ছেলের বৌভাতের কাতান শাড়ি, শেখ হাসিনার নিজ হাতে তৈরি করা ভাবীদের জন্য কারুকাজময় ওড়না। এছাড়া ঘরটির মাঝখানে কাচঘেরা স্থানে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, মারকিন কাপড়–যে কাপড় মুড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হয়েছিল, রক্তমাখা তোয়ালে,বঙ্গবন্ধুর চশমা, বেগম মুজিবের শাড়ি-ব্লাউজ, শেখ নাসেরের রক্তমাখা পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, শেখ রাসেলের টি-শার্ট, কোট, স্কুলের ড্রেস, শেখ কামালের মুক্তিযুদ্ধের শার্ট। বঙ্গবন্ধু যে পবিত্র কোরআন শরিফ পাঠ করতেন সেটিও রয়েছে এখানে।

ঘরটিতে আছে কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা চিঠি। ১৯৭২-এ পাকিস্তান কারাগার থেকে স্ত্রীকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠিও রয়েছে, যে চিঠিটি কারা কর্তৃপক্ষ কাটছাঁট করেছিলেন। আছে দু'টি কফিন।

শেখ জামালের কক্ষটিতেও প্রদর্শনী গ্যালারি করা হয়েছে। এই কক্ষে অসংখ্য গুলির চিহ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা–ঘাতকরা আনন্দ-উল্লাস করার সময় গুলিগুলো এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে যায়। এই কক্ষে রয়েছে শেখ জামালের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র।

৩২ নম্বরের বাড়িটির পেছনের জমিটিতে একটি নতুন ছয়তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনেই ২০১১ সালের ২০ আগস্ট চালু করা হয় সম্প্রসারিত জাদুঘর। ভবনের চতুর্থতলায় প্রথম প্রদর্শনী গ্যালারি। এই গ্যালারিতেই রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বংশ পরিচয়ের তালিকা, পৈতৃক নিবাসের দালানকোঠার আলোকচিত্রসহ প্রথম রাজনৈতিক জীবনের নানা আলোকচিত্র। ভবনের তৃতীয় তলায় রয়েছে ৭ই মার্চের ভাষণের আলোকচিত্রসহ একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দেশি-বিদেশি আলোকচিত্র, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর বিদেশ সফরের আলোকচিত্র।

বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে বন্ধের দিন ছাড়া প্রতিদিনই অনেক দর্শনার্থী বাংলাদেশের বিভিন্নস্থান থেকে এসে ঘুরে ঘুরে দেখে যান। অনেকেই মন্তব্য বইয়ে লিখে যান তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করার কথা। বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুকে যে কতটা ভালোবাসে তার সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায় এখান থেকে। বাংলা'র রাজনীতি আর এই ৩২ নম্বরের বাড়িটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বাড়িটির বাসিন্দা ছিলেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের একটা বড় অংশ আবর্তিত হয়েছে এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাধীনতার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য, বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য, তথা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করা। কালের সাক্ষী হয়ে এ বাড়ি বাঙালিকে প্রেরণা যোগাবে দেশ প্রেমে।

লেখক: সাংবাদিক

কালের পুরাণ

স্বাধীনতার জন্য যিনি ৪৬৭৫ দিন কারাগারে ছিলেন

সোহরাব হাসান

তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সত্য, দেশটির ২৪ বছরের ইতিহাসে কখনোই তিনি নিজেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রতিস্থাপন করেননি। কলকাতায় প্রগতিশীল মুসলিম তরুণদের নিয়ে যে ইনার সার্কেল গঠিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই সার্কেলের প্রধান সংগঠক মোয়াজ্জেম চৌধুরীর সহায়তায়ই ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু আগরতলা গিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহায়তা পাওয়ার আশায়। কিন্তু দিল্লির সঙ্গে যাঁকে যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেটি করতে না পারায় বঙ্গবন্ধুকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। মোয়াজ্জেম চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'শেখ মুজিব যে এক বড় নেতা হলেন, এটার মূল কারণ হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে তিনি কখনো আপস করেননি। অন্যদিকে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও তিনি

গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নির্ভীক ছিলেন এবং সেটার জন্যই পাকিস্তানের এক নম্বর লিডার হয়ে গেলেন।' (১৯৭১ চতুর্থ খণ্ড, আফসান চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলার সেদিনই বিচ্ছেদ ঘটল, যেদিন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দু উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' সূচনালগ্ন থেকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈরী, বিদ্বেষপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালির স্বশাসনের দাবিকে আরও শানিত করে। বঙ্গবন্ধু তখনই মোটামুটি বুঝে গেছেন, 'ওদের সঙ্গে থাকা যাবে না।' কেননা ওদের ভাষা, সংস্কৃতি, চেহারা কিছুতেই বাঙালি বা এ দেশের মানুষের সঙ্গে মিল নেই।

বঙ্গবন্ধুই এ দেশে প্রথম রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ তথা গ্রামের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দীপনাময় ও আবেগময় বক্তৃতা সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করত। নবাব-অভিজাত শ্রেণি যাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, তিনিই তাঁদের নেতা হলেন, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রথম কৃষকের অধিকার নিয়ে রাজনীতি করলেও তাঁর মধ্যে একটি দোলাচল কাজ করত। কিন্তু শেখের বেটা হয়ে উঠলেন সত্যিকারের গণমানুষের নেতা। প্রিয় দেশবাসীর বিপরীতে তাঁর 'ভায়েরা আমার' ও 'বোনেরা আমার' শব্দবন্ধ গোটা জনগোষ্ঠীকে আন্দোলিত করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সবার সঙ্গে থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়া। তিনি যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, তখন সেই পদটি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার তিনি যখন সভাপতির পদ অলংকৃত করেন, তখন সেই পদটিই দলের ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়।

যে দেশের রাজনীতিতে চরম বাম থেকে ডানে যাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ আছে, সে দেশে তিনি বরাবর ছিলেন মধ্যপন্থার অনুসারী। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন; হঠাৎ বিপ্লব-স্পৃহা তাঁকে কখনো আকর্ষণ করেনি। তিনি যেমন ছিলেন সময়ের সন্তান, তেমনি সময়কেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ষাটের দশকে শুরুতে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ ও খোকা রায়ের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটি বৈঠক হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের গতিপথ ঠিক করা। আলোচনার একপর্যায়ে মুজিব বললেন, দাদা, গণতন্ত্র-স্বায়ত্তশাসন এসব কিছুই পাঞ্জাবিরা দেবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাংলার মুক্তি নেই। কমিউনিস্ট পার্টির দুই নেতা তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন, স্বাধীনতার জন্য তো মানুষকে আগে প্রস্তুত করতে হবে। তখন মুজিব বললেন, আপনাদের কথা এখন মানলাম, কিন্তু স্বাধীনতাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। (সূত্র : সাপ্তাহিক একতা, ১৯ আগস্ট ১৯৮৮)

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ বলে পরিচিত ছয়দফা কর্মসূচি এমন সময়ে ঘোষণা করলেন, যখন বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রচণ্ড বিরূপ ধারণা জন্ম নিয়েছিল, ১৯৬৫ সালে ১৩ দিনের যুদ্ধে তারা পূর্ববাংলাকে অরক্ষিত রেখে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আবার যখন চরম বামেরা সত্তরের নির্বাচন বর্জন করে এক পাকিস্তান কাঠামোয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করার চিন্তা করছিল, বঙ্গবন্ধু নির্বাচনকে নিলেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে গণভোট হিসেবে। আর ব্যালটে তিনি এমন অভাবিত বিজয় অর্জন করলেন যখন পাকিস্তানিদের বুলেট, ট্যাংক, কামান–সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

যাঁরা 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি' বলে ফালতু বিতর্ক করেন, তাঁদের ইতিহাসজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ না করে পারা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে সীমিত নয়, বলা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই স্বাধীনতার নতুন সংগ্রামের শুরু। আর স্বাধীনতার এই স্পৃহা বাঙালি মানসে শেখ মুজিব এমনভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে, যেদিন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলেন, সেদিনই বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা কর্তৃত্ব হারাল; বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো গণরাজ অথবা জনগণের শাসন। আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার আগে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চেয়েছেন, কিন্তু যুদ্ধ চাননি। যুদ্ধটা পাকিস্তানিরাই চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, তার প্রধান পুরোহিত ছিলেন শেখ মুজিবই। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন যখন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, তখন তিনি কারাগারে; কিন্তু দল গড়ার প্রস্তুতিটি আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি আসাম থেকে আগত আরেক লড়াকু নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সামনে রেখে এই দল গঠিত হবে, সেসবও তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তখন কলকাতা ছেড়ে করাচিতে এবং আবুল হাশিম ভারতে থেকে যাওয়ায় তাঁদের অনুসারীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়ে শেখ মুজিবের ওপরই। প্রথমে তিনি ছাত্রলীগকে পুনর্গঠন করেন। এরপর বিভিন্ন জেলা শহরে সভা করতে থাকেন।

পাকিস্তান শাসনামলের অর্ধেক সময়ই বঙ্গবন্ধুর কেটেছে কারাগারে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব ও ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নেতা তোফায়েল আহমেদ সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, তা দেখে শিহরিত হতে হয়। তাঁর জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিন কেটেছে কারাগারে। এর মধ্যে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাতদিন কারাভোগ করেন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকারের আমলে। তিনি ১৯৩৮ সালে প্রথম কারাগারে যান। এরপর ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পাঁচদিন তিনি কারাগারে ছিলেন। একই বছর ১১ সেপ্টেম্বর আটক হয়ে মুক্তি পান ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি। এ দফায় তিনি ১৩২ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল আবারও কারাগারে গিয়ে ৮০ দিন কারাভোগ করে মুক্তি পান ২৮ জুন। ওই দফায় তিনি ২৭ দিন কারাভোগ করেন। একই বছরের ১৯৪৯ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন এবং ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পরও বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে যেতে হয়। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু ২০৬ দিন কারাভোগ করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর বঙ্গবন্ধু ১১ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন। এ সময়ে টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়। এরপর ১৯৬২ সালের ৬ জানুয়ারি আবারও গ্রেপ্তার হয়ে মুক্তি পান ওই বছরের ১৮ জুন। এ দফায় তিনি কারাভোগ করেন ১৫৮ দিন। এরপর '৬৪ ও '৬৫ সালে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয়দফা দেওয়ার পর বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৬৬ সালের ৮ মে আবারও গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ দফায় তিনি কারাগারে ছিলেন ২৮৮ দিন। (জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রথম আলো, ৭ মার্চ ২০১৭)

সমকালীন অন্যান্য নেতার সঙ্গে শেখ মুজিবের ফারাকটি উপলব্ধি করা যায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের বয়ানে। আটষট্টি সালে পিডিএম নেতারা সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন তাঁদের ঘোষিত আট দফার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে। কিন্তু তাঁরা যেখানে যান সেখানেই লক্ষ করেন জনসভায় আগত লোকজন শেখ মুজিবের কথা জানতে চান। একবার ট্রেনে যেতে পিডিএম নেতা আবদুস সালাম খান সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলেন তো মানুষ এত শেখ মুজিব, শেখ মুজিব করে কেন? তখন একজন সাংবাদিক বলেন, আপনারা এখন কোথায় আছেন? উত্তর ট্রেনের প্রথম শ্রেণির স্যালুনে। আর শেখ মুজিব কোথায় আছেন? জেলখানায়। তখন ওই সাংবাদিক বললেন, এ কারণেই মানুষ শেখ মুজিব শেখ মুজিব করে। (সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু, আমির হোসেন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশনস)

দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আমাদের রাজনীতি। জীবিতকালে তিনি এ দেশের জনমানসে যে জায়গা করে নিয়েছিলেন, মৃত্যুর ৪২ বছর পর তা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। যাঁরা একসময় তাঁর বিরোধিতা করতেন, তাঁরাও এখন জাতীয়তা ও স্বাধীনতা বিনির্মাণে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। সমসাময়িক রাজনীতিকেরা যেখানে বারবার নীতি পরিবর্তন করেছেন, তাত্ত্বিক বিতর্কে দলকে বিখণ্ডিত করেছেন, সে সময়ে বঙ্গবন্ধু জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্যজ্ঞান করে বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে করে তুলেছেন অনিবার্য। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর অসহযোগও মহাত্মা গান্ধী বা মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো নিছক প্রতিবাদ-আন্দোলন ছিল না; ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো এবং শাসনের বিরুদ্ধে একটি সফল ও বিকল্প শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

১৫ই আগস্টের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে? অবশ্যই নয়। ঘাতকেরাও জানত, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণেই মৃত্যুর পরও তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার চালিয়েছে। একসময় রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র দূরে থাক, বেসরকারি গণমাধ্যমেও তাঁর নাম উচ্চারণ করা হতো না। সেই নিষেধাজ্ঞার দেয়াল পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু আজ বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ও মনন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। সেদিন যাঁরা তাঁকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরাই ইতিহাসের পাতায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় যদি আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন হয়, তাহলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ঘটনা, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা

সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান

ড. শিল্পী ভদ্র

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, স্লোগান ও গানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী, অত্যাবশ্যক, সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' –বঙ্গবন্ধু

এ প্রণোদনামূলক যুদ্ধ-স্লোগান ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল হাতিয়ার। ৭ই মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে ১৯ মিনিটের ভাষণ ছিল অবিনাশী কথামালার। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ প্রেরণা, মুক্তির দিশা, নয় মাসব্যাপী সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ফ্রন্ট ও সশস্ত্র ফ্রন্টকে এক সুতায় গেঁথে অগ্রসর করার নির্দেশ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিতে

পরিণত করার জাতীয় মহাকাব্য। এর রূপকার হলেন একজন রাজনৈতিক মহাকবি; যিনি একের পর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে, তাঁর মেধা-শ্রম-প্রজ্ঞা-সাহস-ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার নিয়ে, বহু মানুষের, বহু কালের আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়ে, বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে 'বাংলাদেশ' নামের রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন–তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। অনেকে তার ৭ই মার্চের ভাষণকে কবিতা বা গীতিকবিতাও বলে থাকেন। কবিরা যথাসম্ভব শব্দ ব্যবহার করেন যে পারদর্শিতায়, ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে এমন সুনিপুণ কথামালায় সাজানো যে তাকে কবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। বলা যায়, লোকগীতিও। লোকগীতির চরিত্রের সঙ্গে এ ভাষণের সাদৃশ্য লক্ষণীয়:

> "বঙ্গবন্ধু তাঁর আপোষহীনতা ও চারিত্রিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছিন লৌকিক ভাব-ভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজনে। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তাসদৃশ কিছু শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত, বুলিসমৃদ্ধ এ রকম একটি লাইন লেখা হলো, 'সাড়ে ৭ কোটি মানুষেরে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।"[১]

'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি তিনি তার কর্মকুশলতায় অর্জন করেছিলেন। একজন সংগ্রামী ও সাহসী মানুষকে দেশবাসী, পরম শ্রদ্ধায় আর ভালোবেসে এই উপাধি দেন। এ ভালোবাসা, এ মমতা তিনি পেয়েছিলেন তার নেতৃত্বের দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা, সাহস, সততা, দেশপ্রেম এবং সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন হয়। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ জনতার মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা এবং ঐ সভার সভাপতি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি। বাগ্মী হিসেবে, জননেতা বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। শুধু তাঁর ভাষণ ও ঘোষণা শোনার জন্যই লাখ লাখ মানুষ ৭ই মার্চ সমবেত হয়েছিল রেসকোর্সে। তারা ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ছিল তার সিদ্ধান্ত শোনার জন্য। একটা বিশাল জনসভায় একজন অবিসংবাদিত নেতার উপস্থিতি এবং ঐদিন এই ভাষণের অপরিহার্যতা ছিল অপরিসীম। কারণ তাঁর ভাষণ অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সেসময়ে তাঁর রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অবস্থান, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব, শ্রোতার সঙ্গে বক্তার শ্রদ্ধা ও সম্মোহনী সম্পর্ক, বিষয় ও উপস্থাপনা স্টাইলের নিজস্বতা, স্পষ্ট বক্তব্য, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, বক্তব্যের চিরকালীন ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রভৃতির জন্য বঙ্গবন্ধুই ছিলেন তখন একমাত্র এবং অনিবার্য নেতা। শেখ মুজিব ছিলেন মুক্তি সেনাদের যুদ্ধের প্রাণশক্তি আবার চালিকাশক্তি বললেও ভুল হবে না। এই মহানায়কের সিদ্ধান্তে জনগণ মনে সাহস ও জীবন বাজি রেখে হাসিমুখে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল। এর প্রমাণ মেলে যুদ্ধকালীন সময়ে লেখা প্রতিটি গানের বক্তব্যে। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ মানেই মুজিব, মুজিব মানেই স্বাধীনতা। তাই তখন স্বাধীনতা সংগ্রামী বা মুক্তিযোদ্ধার প্রধান স্লোগান ছিল: 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু'।

এজন্য এসএম আবদুল গণি বোখারী লেখেন–

'দিনের শোভা সুরুজরে, রাইতের শোভা চান,
ওরে বাংলার শোভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বাংলার বীর-সন্তান
সে যে বাংলা মায়ের নয়নমণি পূর্ণিমার চান।.....
অত্যাচারীর অত্যাচারে তাঁর হয় নাই নত মাথা
ওরে হিমালয় পর্বতের মত(ই) অটল রয়েছেন মোদের
নেতা,
গণতন্ত্রের প্রতীত সে যে বাংলার ধ্রুবতারা
সে বিহনে সোনার বাংলা হয় দিনেতেও আধিয়ারা ॥'

ওপরের গানটির প্রথম দু'লাইন লিখেছেন দোতারা বাদক টগর অধিকারী। আবদুল গণি বোখারীর আরেকটি গান:

'হৈ হৈ হৈ হৈয়া মুক্তির শপথ লইয়া
চল্ চল্ চল্ নওজোয়ান বধিতে দুশমনের প্রাণ
চলো–গাঙ্গে ডাইকাছে মুক্তির বান॥.....
মুক্তির নৌকায় মুক্তির বৈঠা মুক্তির নওজোয়ান,
পথ দেখায়ে নিবেরে শেখ মুজিবর রহমান।
একবার জয় বাংলা জয় বাংলা বইলা জোরে মার টান্‌রে॥'

তৎকালীন সাহিত্য, গান, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, চিত্রকলা প্রভৃতির মূল প্রসঙ্গ ছিল 'শেখ মুজিবুর রহমান'। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্যে পড়েছিল বলেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লিখেছিলেন:

'বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান
বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি ॥
তিতুমীর, ঈশা খাঁ, সিরাজ সন্তান এই বাংলাদেশের
ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, নেতাজী সন্তান এই বাংলাদেশের
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটারে কাঁপিয়ে দিল
কার সে কণ্ঠস্বর, মুজিবর সে যে মুজিবর
জয় বাংলা বলেরে ভাই ॥'

–এই গানটির সুর দিয়েছেন সমর দাস। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অসংখ্যবার গীত হয়েছে। বেতারে প্রচারিত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে:

'মুজিব বাইয়া যাওরে

নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাও রে.....
ও মুজিব রে,
অত্যাচারীর উৎপীড়নে দিক না যতই ব্যথা
সাত কোটি বাঙালির প্রাণে
মুজিব তুমি নেতারে।'

–এই গানটির কথা লিখেছেন সরদার আলাউদ্দিন, সুর নেয়া হয়েছে প্রচলিত 'মাঝি বাইয়া যাওরে' জনপ্রিয় গানের আদলে। গানটির শিল্পী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও অংশুমান রায়ের সুর ও কণ্ঠে বেজেছে–

'শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ॥

সেই সবুজের বুকচেরা মেঠো পথে
আবার এসে ফিরে যাবো,
(আমার) হারানো বাংলাকে তো ফিরে পাবো।

শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে এমন সোনার দেশ
বিশ্ব কবির সোনার বাংলা , নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।

'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার
এখনো কেন ভাবো,
(আমার) হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
অন্ধকারে পূবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি ॥'

তোরাপ আলী শাহ'র কথা,সুর এবং কণ্ঠে–
'মুজিবুর সত্য যুগের' এবং
হাফিজুর রহমানের লেখা ও সুরে–
'আমার নেতা শেখ মুজিব'–গানটি স্বাধীন বাংলা বেতারে অসংখ্যবার গীত হয়েছে। শেখ মুজিব একটি আদর্শ, বিজয়, নির্ভীকতার প্রতীকের নাম তখন। প্রতিটি মুক্তিসেনাই যেন এক একজন মুজিব। সমবেত কণ্ঠে বেতারে বেজেছে–

'মজিবর মজিবর মজিবর
আজ গ্রাম বাঙলার পথ প্রান্তর
আওয়াজ তুলিছে ধ্বনি সমস্বর

তোমারি জলদ গম্ভীর বজ্র কণ্ঠস্বর।
নেই মিছে আর কোন ভয় সংশয়–।'

অথবা শহীদুল ইসলামের গান:
'জীবন যুদ্ধে আমরা সবাই লড়ছি
লড়ছি মোরা, গড়ছি সোনার দেশ
সাত কোটি প্রাণ একটি মুজিব হয়ে
শোষণ-পেষণ-মৃত্যু নিপাত করছি।'

তার আর একটি গান:
'মুজিব এই বাংলার উন্নত শিরে
মুজিব এই বাংলার ঘরে ঘরে
কে তারে রুখতে পারে।
সত্য-ন্যায়ের সে রক্তটিকা
দুস্থ প্রাণের সে বহ্নিশিখা
সে যে বুভুক্ষ হৃদয়ের হাহাকারে ॥
যখনি মানুষ মানুষের রক্ত চোষে
যখনি অন্যায় সীমা ছাড়িয়ে আসে
নিপীড়িত হৃদয় থেকে
তখনি মুজিব বেরিয়ে আসে ॥'

বাংলার ইতিহাস উঠে এসেছে মুজিবের গানে–
'ইয়াহিয়ার গৃহবাস
ভুট্টার ক্ষেতে করছে সর্বনাশ,
এখন ইয়াহিয়া ভুট্টা খাইয়া
করছে সদায় হা হুতাশ
ভুট্টার ক্ষেতে.....॥
ভুট্টা যখন ঢাকায় আইলো
ইয়াহিয়ারে বুঝাইলো
শেখ মুজিবকে বন্দী কর
বাঙালির প্রাণ কর নাশ
ভুট্টার ক্ষেতে.....॥' (কথা ও সুর: মোমতাজ আলী খান)

'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' বা 'জয় মুজিবর' তখন যেন মিছিলের স্লোগানই নয়; সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রতীক বনে গিয়েছিল। শ্যামল গুপ্ত তাই লিখলেন:
'সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম মুজিবর
সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম
জয় বাংলা, জয় মুজিবুর, জয় বাংলা, জয় মুজিবুর ॥
এ যে শপথের রক্তের স্বাক্ষর, এ যে আগুনের মন্ত্রের অক্ষর
অগ্রগামী মুক্তিকামীর মনস্কাম–মুজিবর.....
এ যে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত গণসত্তায় জাগরণ
এ যে নির্ভয় দুর্জয় গণসংগ্রাম আমরণ–মুজিবর।'

'জয় বাংলা' নিয়ে আরেকটি গান লিখেছেন, শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী
'জয় বাংলা জয় বাংলা বলে
সবে আয়রে বাঙালি
সোনার বাংলা স্বাধীন হইয়াছে।.....
ময়ূরপঙ্খী নৌকা মোদের ঠেকছিল চড়ায়
এখন নয় যুগের বান ডাইকাছে বাংলার দরিয়ায়
এবার সাত কোটি লোক টানছে বৈঠা
বঙ্গবন্ধু হাল ধইরাছে ॥'

এই গানটি এইচএমভি'র রেকর্ডকৃত। এইচএমভি (হিজ মাস্টার্স ভয়েজ) থেকে পাওয়া যায় আরো কিছু গান:
'ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
জয় বাংলা বলিয়া আইসো
রঙিন পাল উড়াই ॥
ও মাঝি ও, ওরে ছয় দাঁড়েতে
নৌকা চলে মুখে আল্লাজী
ওরে বাঁকা নায়ের হাল ধইরাছে
গোপালগঞ্জের মাঝি ॥
ও মাঝি ও, গোপালগঞ্জের নায়ের মাঝি
বাংলাদেশের নাইয়া
সে যে সব দুঃখীরে পার কইরা দেয়
জয় বাংলা গান গাইয়া ॥'

এই গানের শিল্পী: রথীন্দ্রনাথ রায় তবে রচয়িতা অজ্ঞাত।
আবার
'বাংলা মায়ের রাখাল ছেলে বাঁশি দিলো টান
শোন ভাই হিন্দু-মুসলমান
মায়ের মুখে ফুটলো হাসি পালাইছে বেঈমান
রে ভাই পালাইছে শয়তান ॥ '
গানটির গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী।
অথবা'
'বঙ্গবন্ধুর ডাকে রে
মুজিব ভাই ডাকে রে
কে কোথায় আছে
মাঠে-ঘাটে, গঞ্জে-হাটে
কোথায় আছ
গ্রামে-শহরেতে কলে-কারখানাতে
কোথায় আছ
হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ–
মিলি আয় লাখে লাখে রে ॥'

গানটির গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার ও শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

হরলাল রায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কয়েকটি গান লিখে সুর দিয়েছেন, তা হলো:

১. .....
জয় করিয়া বাঙালির মন, বঙ্গবন্ধু ন্যায্য ভোটে জিতি ॥
সেই না দোষে দোষী হইল বন্দী কইল্লে
শয়তান ইয়াহিয়া তাই।'

২. .....
কান্দে বাংলা দ্যাশ
ওঠে মজিবর মজিবর শেখ মজিবর ধ্বনি
বাঙালির দুখিত্ অন্তর রে।.....
পাছের চিন্তা এহিয়া করিস নাই ॥'

৩. .....
(ও তুই) কোন্ঠে আছিস বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর
কান্দে পরাণ তোর বাদে হামার
ও তুই মুক্তিফৌজক দোয়া করিস
আল্লা রক্ষা করুক তোমার প্রাণ ॥'

৪. .....
জয় বাঙলা বাঙালির জয় শেখ মজিব
মন্ত্র দিল বাঙালিদের কানে
সেই না মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল
ঘুমন্ত নাগ নাগিনীরে' প্রভৃতি।

বাংলার লোক-দর্শনের সারকথা সার্বজনীন মানবপ্রেম। এই লোক-দর্শনের মমার্থ মেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জীবনে। বাংলার ইতিহাস বলে, হাজার বছর ধরে শাসিত বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান রাজাদের রাজনৈতিক আদর্শে একটি অভিন্ন মানবিক সংস্কৃতি বিরাজমান। দেখা যায়, বাংলার প্রায় তিন হাজার বছরের শাসনামলের শাসকদের মধ্যে অহিংসা, মানবপ্রেম ও মানবতাবাদের নানা উপাদান প্রাচুর্য। এজন্য অনেক নৃজাতির সম্মিলন-সংশ্লেষ, নদীমাতৃকতা, সর্বোপরি বাংলার ভূগোল, জলবায়ু দায়ী। তাই-বুঝি গৌতম বুদ্ধ, শীল ভদ্র, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, কবীর- নানক, চৈতন্য-লালন প্রমুখ সন্তের উদার-মানবতাবাদের বিচরণ দেখি ভারতবর্ষে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক রূপকারদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম

আজাদ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখকে পেয়েছি আমরা। মানুষের সবচে' বড় অস্ত্র ভালোবাসা। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের মূল। শেখ মুজিব এই মন্ত্রে এদেশের লক্ষ প্রাণকে জাগিয়েছিলেন। তেমনি একটি গান লিখেছেন কার্তিক কর্মকার–

শোন ঐ শোন বাংলাদেশের
শিকল ভাঙার গান,
জয়তু মুজিব! কোন সে মন্ত্রে
জাগালে লক্ষ প্রাণ ॥.....
চাই মুক্তি–চাই স্বাধীন বাংলা
মুক্তি সেনানী হাঁকে,
বাঁচার কারণে মরণ চিনেছে
বঙ্গবন্ধুর ডাকে;
পুবের আকাশ হ'য়ে যাক নীল
লাল হোক অবসান ॥'

কিংবা তার:

'ভাইরে ভাইরে ভাই
হিন্দু-মুসলমান,.....
বঙ্গবন্ধু মুজিবর ঐ বজ্রকণ্ঠে হাঁকে,
সাড়ে সাত কোটি ওরে ভাইবোন–
জাগ্‌রে মায়ের ডাকে ;
যায় যদি প্রাণ যাক্‌না আজিকে
হও সবে আগুয়ান ॥'

জাতিকে জাগিয়ে, হাজার হাজার বছরের শৃঙ্খলিত জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। জাতির পিতার এ আহ্বানে সমগ্র জাতি সাড়া দেয়, তারা গর্জে ওঠে ক্ষমতালোভী দালালদের বিরুদ্ধে। তাই চারণ কবি মো. সিরাজুল ইসলাম লিখলেন:

'বাঙালিরা জানের জান
রাখতে হবে বাঙালিদের মান
ওরে কাঙালের দরদি এলো
শেখ মুজিবর রহমান ॥....
বাঙালিদের নয়নমণি
শেখ মুজিবর গুণের গুণি
আল্লা মোদের সহায় আছেন
রাখবো না দালালের জান ॥'

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জাতির পিতা সেজে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব মুছে দিতে চেয়েছিলেন। তখন শেখ মুজিবকে বাঙালিরা তাদের 'প্রকৃত মুক্তির, প্রকৃত বন্ধু' হিসেবে স্থির করে–সেকথা ব্যক্ত হয়েছে বিদগ্ধ কবি মোকসেদ আলী সাঁইর রচনায়:

'বাংলার খাঁটি মানুষ
শেখ মুজিবর জেনো ভাই
তার মত আর বাংলার বন্ধু নাই ॥
তেইশ বছর অনেক নেতা
সেজে এলেন জাতির পিতা
এখন মোদের খাঁটি ত্রাতা
শেখ মুজিবকেই পাই ॥'

সে ধারাবাহিকতায় ২৫শে মার্চ শেখ মুজিবকে গোপনে আটক করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার প্রহসন বিষয়ে বিচার গানের-কবি, আবদুল হালিম রচনা করলেন:

'জাতির পিতা মহান নেতা (তারে) ছাড়বি কিনা বল
বন্দিশালায় ভাঙব তালা বাঙালি ভাই চলরে চল ॥
শোন বলিরে ভুট্টো মিয়া শেখ সাহেবরে দাও ছাড়িয়া
না হয় থাক সাবধান হইয়া আসিতেছে পাগলা ঢল ॥'

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা শেখ মুজিব ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। যুদ্ধ-সেনাপতি মুজিবের মুক্তি মানে, বাংলার মুক্তি। সে প্রসঙ্গেই গান লিখেছেন মো. সিরাজুল ইসলাম:

'হারে ও আমার বাংলার শেখ মুজিব
বাংলাদেশকে কইরাছ সজীব
৭ কোটি বাঙালির তুমি হইছ নয়নমণি
দুখি মায়ের দুখি সন্তান বানাইবা সব ধনি ॥.....
এসো এসো মোরা লড়াই করি দেশের লাগিয়া
তোমাকে আনিব মুজিব জেলখানা ভাঙিয়া
ইয়াহিয়া ভুট্টোরে মারব লাঠি দিয়া
তোমাকে করিব মুক্ত থাকব না আর পরাধীন ॥'

বাংলাদেশ ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীন হলো। বাঙালির আনন্দ যেন ধরে না; মুক্তির আলোর ঝরনা ধারার মতো তা বয়ে চলল। এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে তারা শেখ মুজিবকে পাশে না-পেয়ে ব্যথায় ম্রিয়মাণ হলো। এর চিত্র রয়েছে গীতিকার শহীদুল ইসলামের একটি বিখ্যাত গানে, এর সুরকার সুজেয় শ্যাম। গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধের শেষ গান, এর তাল কাহারবা:

'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
খুশির হাওয়ায় ঐ উড়ছে
বাংলার ঘরে ঘরে
মুক্তির আলো ঐ ঝরছে।
আজ জীবনের জয় উল্লাসে
জমছে শিশির দুর্বাঘাসে
পাশে নেই আমাদের মহান নেতা
হাসির মাঝে আজ জাগে ব্যথা
সাত কোটি প্রাণ দিকে দিকে ঐ
দীপ্ত মশাল জ্বেলে চলছে ॥
অন্ধ কারার আঁধার থেকে
ছিনিয়ে আনবো বঙ্গবন্ধুকে
উচ্ছল বন্যার কলগ্রাসে
শত্রুরা নিশ্চল হয়েছে
মহাশক্তিতে কোটি কোটি প্রাণ
ঐ বন্ধ কারার দ্বার খুলছে ॥'

এরপর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন যে গণমনে কতটা উচ্ছ্বাস এনেছিল, তার চিত্র ফুটেছে গণেশ ভৌমিকের গানে:

'বাংলার স্বাধীনতা আনলো কে?
মুজিব মুজিব মুজিব
মুক্তির আলোকে রাঙালো কে ?
মুজিব মুজিব মুজিব ॥.....
বাংলার অগণিত নন্দিত গর্বিত
সত্তার বন্দিত বেদনার রক্তটীকা ॥
বাংলার মাটিতে আঁকলো কে?
মুজিব মুজিব মুজিব ॥'

তিনি আবার লিখলেন:

'আমি একজন মুক্তিসেনা
শত্রুর সাথে লড়ে চলেছি.....
বাংলার ঘরে ঘরে আজ
শোন কোটি মুজিবের কণ্ঠ–
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
ঐ উঠে লাল সূর্য ॥'

কিংবা তার–

'আমরা মুক্তিসেনা
আমরা ভয় করি না
আমরা বীরাঙ্গনা.....
বাঙ্গালী সব এক হইয়া
শেখ মুজিবের মন্ত্র নিয়া
মরণকে আর ভয় করি না .....॥'

মুজিব তখন সর্বমানবের মহানায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি, মহান নেতা, অগ্রদূত, বাংলার বন্ধু, খাঁটি ত্রাতা প্রভৃতি অভিধায় জনগণ তাকে অভিসিক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, গ্রাম-বাংলার জারিয়াল-কবিয়াল-চারণকবি-গীতিকারদের কাছে তিনি নায়েবে রসুল বা ভগবান-দেবতা, অবতার প্রভৃতি আসনে আসীন হয়েছিলেন; তার প্রকাশ ঘটেছে গানের শব্দ-আখরে:

'হে মহান! তুমি আদর্শ মানব তুমি পুরুষ প্রধান
তুমি সত্যের প্রতীক তুমি ধার্মিক ও নির্ভীক

তুমি সার্বভৌমিক তুমি ন্যায় নিষ্ঠাবান।
গুল-বাগিচার ফুল তুমি নীল দরিয়ার জল,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গের ফল,
পরিত্রায়ন সাধুনাং বিনাশয়চং দুস্কৃতম,
ধর্ম সংস্থাপনার্থে কলিযুগের অবতারম,
তুমি হিন্দু ও বুদ্ধ, তুমি শিখ ও শুদ্ধ,
তুমি ক্ষুব্ধ নয় লব্ধ তুমি জব্দ মোছলমান ॥
জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তুমি নায়েবে রসুল,
ভাঙিতে এসেছ তুমি বাঙ্গালির ভুল,
রুদ্র রূপে ভীম তুমি শুদ্র রূপে কাম,
জীবের মধ্যে সজীব তুমি, মুজিব তোমার নাম
তুমি ইন্দ্র ও চন্দ্র, তুমি বরুণ সুরেন্দ্র,
ধীরেন্দ্র কুমার তুমি বীরেন্দ্র সন্তান ॥'

–গানটি লিখেছেন নড়াইলের জারিয়াল মোসলেমউদ্দিন, কবি নজরুল ছন্দে। এ শ্রেণির আরেকটি গান তিনি লিখেছেন গজল আঙ্গিকে:

'ভাগ্যবতী মেয়ে তুমি, মা ভাগ্যবতী মেয়ে
তোমার বুকে বঙ্গবন্ধু এলো দয়াল রূপ ধরিয়ে ॥.....
ধর্মকে করতে সংস্কার, হরণ করতে ধরণীর ভার।
অবতারি হইয়ে এসো নরাকারে দয়াল আমার
আঁধারে যায় আলোক দিয়ে ॥
তোমাকে করিতে উদ্ধার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর,
ঘর-বাড়ি ছাড়িয়ে আজ ২৪ বৎসর পথে পথে
মহা দুঃখ শিরে লইয়ে ॥
২৫ শে মার্চের রাত ১২টায় সোনার বাংলায় গুলি চালায়,
নির্দয় নিষ্ঠুর হইয়ে দুষ্ট ইয়াহিয়ার ষড়জালে
বন্ধু থাকলেন বন্দি হইয়ে ॥'

আবদুল হালিম বয়াতিসহ আবদুল লতিফ, রেজাউল করিম চৌধুরী, শাহ আবদুল করিম, শফি বাঙালি, মহিন শাহ্, কাঙাল কেবর, আবদুল গণি, মুস্তাফিজুর রহমান, প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া, সাইদুর রহমান বয়াতি প্রমুখ শত শত গীতিকারের গান রয়েছে মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধকে প্রসঙ্গ করে। মোসলেম বয়াতির অর্ধশতাধিক গানের সন্ধান মেলে। এ শ্রেণির কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো, এগুলোর রচয়িতা আবদুল হালিম বয়াতি:

১. 'বাঙালি জাতির পিতা মহান নেতা শেখ মুজিবর/বিনা দোষে শেখ সাহেবরে বন্দি করল জেলের ভিতর ॥'
২. 'কোথায় রইলা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা থুইয়া
অর্ধনমিত নিশানে তোমার বেদন যাচ্ছে গাইয়া ॥'
৩. 'বঙ্গবন্ধু মহান বাণী ভুলবো না
রমনা মাঠে অকপটে করেছিলে কল্পনা ॥'
৪. 'জাতির পিতা মহান নেতা তুমি যে মহান
তুমি বাংলার শিরোমণি যেমন ঈদের চান ॥'
৫. 'মায়ের কান্দনে কান্দে বনের পশু পাখিরে
লাগল পুত্রের শোক কলিজায়রে ॥'

তেমনি আবদুল লতিফ লিখলেন:

১. 'এ বাংলা বাংলা আমার বার ভুইয়ার বাংলারে,
এ বাংলা বাংলা আমার ঈশা খানের বাংলারে,
এ বাংলা শীতালাং শাহ্র
এ বাংলা শিরাজ শাহ্র
এ বাংলা গগন, মদন, হাসন রাজার, লালান শাহ্র বাংলারে ॥
এ বাংলায় জন্মেছিল সিংহপুরুষ হাজার লক্ষ নেতার নেতা
স্বাধীন বাংলা তাহারই দান অস্বীকার করিবে কে'তা
এ বাংলার নয়নমণি
কণ্ঠে যার বজ্রধ্বনি,
সে হলো সবার মিতা জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
শেখ মুজিবর রহমান ॥'
২. আয় রে যাদু, দেখ রে যাদু,
শোনরে কেমন মধুময়,
ছেইলা মাইয়া জোয়ান বুড়া
একটি কথায় কয়–.....
চিনা লও ভাই যাদুকর,
নাম হলো যার শেখ মুজিবর
ও যার, নামের গুণে আঁধার পুরী
এক পলকে উজ্জ্বল হয় ॥'
৩. 'ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই, ও যাদু ভাই, ও মধু ভাই–
দুঃখের দইরা হইবা যদি পার,
দেখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাইল ধইরা বইছে নৌকার ॥'
৪. 'জাগো জাগো জাগোরে বাঙালী ভাই
আর কতকাল থাকবি ঘুমে
দেখরে চেয়ে নিশি নাই ॥.....
তিতুমীরের বাংলা এ যে শেরে বাংলার বাংলা এই
শেখ মুজিবের বাংলা এ যে সূর্যসেনের বাংলা এই;
এই বাংলাদেশে জন্ম আমার সেই গরবে বুক ফুলাই॥'

রেজাউল করিম চৌধুরী লিখলেন:

'সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গীকার
প্রতিকার নয় প্রতিশোধ, প্রতিশোধ
প্রতিশোধ নেব এবারি।.....
আমাদের নেতা শেখ মুজিবর দিয়েছে যে মন্ত্র
বিচ্যুত হবো না মোরা মানবো না কোন ষড়যন্ত্র।'
অথবা
'ওরে আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরারে
প্রাণে মাইরা চল পাক হানাদারকে।.....
শেখ মুজিবর তাইতো এবার হুকুম দিয়াছে
প্রাণে মাইরা চল পাক হানাদারকে ॥
শেখ মুজিবর নেতা আমার
শেখ মুজিবর রাজা বাংলার
শেখ মুজিবর প্রিয় যে সবার।
ওরে শেখ মুজিবের ছায়াতলে
হাসছে বাংলাদেশ
যুদ্ধ যখন শুরু হইছে
হবে তারই শেষ,
সাত কোটি বাঙ্গালী তাই যে অস্ত্র ধইরাছে
প্রাণে মাইরা চল পাক হানাদারকে ॥'
বা,
'আমরা অগণিত মুক্তিসেনা
আপোষের কোন কথা মানি না.....
আমরা জেগেছি মুজিবের ডাকে
জেগেছে বাংলাদেশ
অস্ত্র ধরেছি সুকঠিন হাতে
শত্রুর করবো শেষ
আমরা মৃত্যুর ভয় জানি না ॥'

মুস্তাফিজুর রহমান রচনা করলেন:

'সংগ্রাম আজ শুধু সংগ্রাম
বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম
সংগ্রামে সোচ্চার বাংলা
মুজিবের বাংলায় আজ কোন কথা নয়
সংগ্রাম আজ শুধু সংগ্রাম ॥'

প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া আবার কথা ও সুরে জানালেন:

'দুর্বার দুর্বার আমরা
দুর্বার আমরা মুক্তিসেনা
মুক্তির শপথে উদ্দাম.....
মুজিবর মুজিবর বাংলার প্রিয় নেতা
সূর্যের অক্ষরে নাম ॥'

মো. শফি বাঙ্গালী সৃষ্টি করলেন বিশাল এক গান, সুরও দিলেন তিনি তাতে। গানটি 'মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না' বাক্যে শুরু এবং শেষ। তার মধ্যেই এদেশের পাকিস্তান শাসনামলের ২৪/২৫ বছরের শোষণ-শাসন, পাকিস্তানি-বাঙালি জাতির তুলনামূলক আলোচনা–যেখানে খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেও কিছু লাভ হয়নি বরং তা তাকে আন্তর্জাতিক নেতায় পরিণত করেছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানের

অমিত শক্তি, এর ওপর বাঙালির আস্থা–এসব বিষয় রয়েছে। এদেশের শ্রমিক-চাষী, হিন্দু-মুসলমান, এপার বাংলা-ওপার বাংলার সব বাঙালি মিলে পাকিস্তানি ইয়াহিয়াকে তাড়াবেই। সর্বোপরি 'জয় বাংলা' মন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের লড়াই চালিয়ে যাবে। তারা সংগ্রামের পথ ছাড়বে না জয়ী না হওয়া পর্যন্ত। শুধু তাই-ই নয়, এ গানটা তিনি চারণবেশে বাংলার হাটে, মাঠে, পথে-প্রান্তরে গেয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন আপামর জনমানসকে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে জনসভায় ভাষণদানের আগে তিনি তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে সেখানে গাইতেন। বিখ্যাত সে গানটি হচ্ছে:

'আমরা ছাড়বো না ছাড়বো না
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না।
সাত কোটি বাঙ্গালী এবার করছি মরণ পণ
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবো জনমের মতন
বসে থাকবো না থাকবো না ॥
জীবন দিছি রক্ত দিছি দিব জীবন আরো
তবু বলবো বেঈমানের দল সোনার বাংলা ছাড়ো
জিততে দেবো না দেবো না ॥
কেবা হিন্দু কেবা মুসলিম এ সকল যাও ভুলি
জন্মগত হিন্দু মুসলিম জাতে হয় বাঙ্গালী
বিভেদ চলবে না চলবে না ॥
এপার বাংলা ওপার বাংলা নয় রে ব্যবধান
মধ্যে একটু জলের স্রোতা তলে মাটি খান খান
জানো না জানো না ॥
খানের আছে রাইফেল বন্দুক করতে পারো গুলি
আমরা একতাতে পাহাড় ভেঙ্গে শূন্যে-উড়াল তুলি
বাঙ্গাল হটে না হটে না- ॥
ছলে কলে পঁচিশ বছর বাংলা খাইলা চুষি
জাতিরে বাঁচিতে যাইয়া মুজিব হইল দুষি
তোমরা জানো না জানো না ॥
চব্বিশ বছর লুট করেছ লুটতো ডাইনে বামে
শেখ মুজিবকে বন্ধ করছো আগরতলা নামে
রাখতে পারলা না পারলা না ॥
জোর জবরে শেখ মুজিবকে দিছে ফাইস্যা বেটা
আসলে বানাইয়া দিছে আন্তর্জাতিক নেতা
কারবার মন্দ না মন্দ না ॥
সাত কোটি বাঙ্গালীরা মুক্তিযোদ্ধা আজ
ঘরে ঘরে দুর্গ উঠছে 'দূর হও' আওয়াজ
রুখতে পারবা না পারবা না ॥
খানের আছে কামান বিমান অসম্ভব ক্ষমতা
মোদের সহায় আল্লাহ আছে আর আছে জনতা
আমরা ডরাই না ডরাই না ॥.....
সাত কোটি এই নরনারী হইয়াছে তৈয়ার
বুকের সিন্ধু বঙ্গবন্ধু কলিজা দিব তার
কিসের ভাবনা ভাব না ॥
কলের ঘরে জাগলো শ্রমিক মাঠে জাগলো চাষী
সারা বিশ্বে উঠছে এখন জয় বাংলাইে বাঁশী
তোমরা শোন না শোন না ॥.....
আমায় তুমি জেলে নিবা নাহয় করবা গুলি
কবরে শুয়ে বলবো আমি বাঙ্গালী বাঙ্গালী
খানকে চিনি না চিনি না ॥.....
বিশ্ব মাঝে রাস্তাঘাটে যানবাহন যে চলে
ঘুরে ঘুরে গাড়ির চাকা জয় বাংলাটি-বলে
তোমরা শোন না শোন না।
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না ॥ (সংক্ষেপিত)'[২]

গান, কবিতা, স্লোগান প্রভৃতিতে প্রতিফলিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাঙালি জাতির এত আশা, এত উন্মাদনার কারণ কি? উত্তর পেতে হলে ইতিহাসের অতীত পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রায় ১৫০ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা নিষ্পেষণের পর ১৯০৫ সালে বাঙালি জাতি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধে। কিন্তু সে আন্দোলন ছিল খণ্ডিত। ১৯৪৭-র ১৪ আগস্ট অখণ্ড ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'পূর্ব বাংলা' তখন 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান দু'টি ভূখণ্ডের দূরত্ব হাজার মাইল সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় চেতনায়, মুসলমানদের রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে বাঙালি নতুন অথচ ভয়ানক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। সেখানে ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিকে ভাষা-গোত্র-সংস্কৃতির দিক থেকে পঙ্গু করার পাকিস্তানি শাসকের নীলনকশা বাঙালি অল্পদিনেই অনুধাবন করে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে রাজপথে আন্দোলনে নামে। তারা 'বাঙালি জাতি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দৃঢ়ভাবে সংকল্পিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪-তে নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করেন। পাকিস্তানি সামরিক গোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে, ধর্মনিরপেক্ষ ধারা প্রচলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। তিনি ১৯৬৬-র, ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ৬-দফা দাবি পেশ করেন। এই ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তির দলিল। ১৯৬৬-তে তিনিই আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র

66

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪-তে নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ... পাকিস্তানি সামরিক গোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে, ধর্মনিরপেক্ষ ধারা প্রচলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগে পরিণত হয়।

99

মামলার শিকার হন। ১৯৬৯, ১৬ ফেব্রুয়ারিতে পল্টনের বিশাল জনসভা শেষে মওলানা ভাসানী মিছিল করেন রাজধানীতে। তার স্লোগান ছিল 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো', 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো'। ১৯৬৯'র ২১ ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার এবং ২২ ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন। এই সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব পাকিস্তান'কে 'বাংলাদেশ' নামে ঘোষণা দেন। ১৯৭০'র ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক বিজয় অর্জন করে। ৩০০ আসনের মধ্যে তার দল ১৬০টি আসন লাভ করেন। দলপতি হিসেবে তারই সরকার গঠনের কথা কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রতিবাদে ১৯৭১-এ তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার ধারক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯-১৯৭০'র গণঅভ্যুত্থান বাঙালির প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতার স্পৃহা স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত বিগত কয়েক দশকে এ অঞ্চলের বাঙালি মানসে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে–সব সম্প্রদায়ের মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। তখন সর্বস্তরের বাঙালি স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি সুকৌশলে ধাপে ধাপে আমাদের স্বাধীনতার প্রাপ্তিকে সফল করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ব্যতীত এ অর্জন সম্ভব হতো না। যার প্রতিফলন রয়েছে উপরে বর্ণিত গানগুলোর শব্দ আখরে, সুর মূর্ছনায়।

তথ্যসূত্র

১. *ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা.) 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাস ও তত্ত্ব', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৬৮*
২. *ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, 'ভাষা ও দেশের গান স্বরলিপিসহ', অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২০১-২০৩*

লেখক: গবেষক

বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা’

মুক্তি সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দলিল

দিপংকর গৌতম

প্রকাশক: বাংলা একাডেমি
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৭
মূল্য: ৪০০ টাকা

১৯৪৭ সালে ঘৃন্য সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে যে বিষফোঁড়াটির জন্ম হয় তার নাম পাকিস্তান রাষ্ট্র। এটি আবার ১২০০ মাইলের ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম নামে বিভক্ত হয়। আতুড় ঘরে থেকেই পাকিস্তানে একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানকে শোষন করা এবং বিভিন্নভাবে তাদের পর্যুদস্ত করা। এজন্য তারা প্রথমে আঘাত হানে ভাষার উপর। তারা বুঝতে পারে ভাষাকে আগ্রাসন করা গেলে একটা জাতিকে অন্ধ করা সম্ভব। এবং তাকে শাসন ত্রাসনের জন্য অন্যকিছুর দরকার নেই। প্রতিষ্ঠার সাত মাসের মাথায় পাকিস্তান ভাষার উপর আঘাত হানে। সিংহভাগ

মানুষের ভাষা বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত আঁটে। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিযোগে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হন। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বহু বছর পাকিস্তানের কারাগারে কাটাতে হয়। ছয় দফা আন্দোলনে ও আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তারের পর ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুর্মিটোলা সেনানিবাসে অফিসার মেসে বঙ্গবন্ধুর অন্তরীণ থাকাকালীন দিনলিপির বিবরণ নিয়েই 'কারাগারের রোজনামচা' লেখা হয়েছে। এটি বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় রচনা। বাংলা একাডেমি কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়েছে গত মার্চে।

শুরুতে নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। এ ভুমিকা পাঠের পরে যে কারো মনে হবে মূলত এই বই প্রকাশ হতে মোট ৩ টি কারাগারকে অতিক্রম করা হয়েছে। কারাগারে এটি লেখার পর বিদূষী ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের হাতে আসে। এটি হাতছাড়া হয়ে যায় বাঙ্গালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম লগ্নে এ জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকে সমূলে বিনষ্ট করতে ২৫ মার্চ কাল রাতে অপারেশন 'সার্চ লাইট' এর মাধ্যমে গনহত্যা শুরু এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, প্রথম সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সামরিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু পরিবারকে ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। পড়ে সামরিক বাহিনী তাদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার মায়ের পরামর্শে খাতাগুলে লুকিয়ে নিয়ে আসেন। আর ৩য় বার হলো-১৯৭৫এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করলে বাড়িটি অরক্ষিত থাকে। জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর পর বাড়িতে পুনরায় ঢুকে এ খাতাকে পুনস্তদ্ধার করা হয়। এটা কোন সহজ ঘটনা নয়।

পাঠকের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকাটি বেশ সহায়ক হয়েছে। সঙ্গত কারণে রোজনামচার জেলজীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই গ্রন্থে সমকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা বস্তুনিষ্ঠ, প্রাঞ্জল ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'থালা-বাটি কম্বল, জেলখানার সম্বল'

বঙ্গবন্ধু তার রোজ নামচায় বৃটিশ আমল থেকে জেল সম্বন্ধে সাধারন মানুষের ধারনাটিকে পুনরায় তুলে ধরেছেন। রোজনামচার ভুমিকা লিখতে বঙ্গবন্ধু এ শিরোনামটিকে বেছে নিয়েছিলেন। এবং জেলখানার খুটিনাটি বিষয় তুলে ধরেছেন এ লেখার মধ্য দিয়ে। এবং তিনি লিখেছেন-

'জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই তারা জানে না জেল কী জিনিস। বাইরে থেকে মানুষের যে ধারণা জেল সম্বন্ধে ভিতরে তার একদম উল্টা। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে।'

জেলখানার ভেতরে বসবাসের জন্য বিভিন্ন সরকারের করা নিয়মাবলী রয়েছে। জেলের বাইরে থেকে জেলের ভেতরের এ সাম্রাজ্যকে ভাবা দুষ্কর।

যেমন, রাইটার দফা, চৌকি দফা, জলভরি দফা, ঝাড়ু দফা, বন্দুক দফা, পাগল দফা, দরজি খাতা, মুচি খাতা ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে রাজবন্দিদের সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বন্দিরা সপ্তাহে একটি চিঠি আর ১৫ দিনে একবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত। কিন্তু সেখানেও বাধা-নিষেধ ছিল। গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মচারীদের পড়ার পর চিঠি হাতে পাওয়া যেত, সাক্ষাতের সময় গোয়েন্দা ও জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকত। বড় পীড়াদায়ক সব কাহিনী এখানে লিখেছেন বঙ্গবন্ধু। এর মধ্যে এক রূঢ় বাস্তবতাও রয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধু প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আকিঞ্চনে এটু সময় চান। যেখানে গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তাতো সম্ভব না। জেলের বিভিন্ন সরকারের গড়া নিয়ম সম্বন্ধে তিনি দুঃখ করে লিখেছেন:

'নিষ্ঠুর কর্মচারীরা বোঝে না যে স্ত্রীর সাথে দেখা হলে আর কিছু না হউক একটা চুমু দিতে অনেকেরই ইচ্ছা হয়, কিন্তু উপায় কী? আমরা তো পশ্চিমা সভ্যতায় মানুষ হই নাই। তারা তো চুমুটাকে দোষণীয় মনে করে না। স্ত্রীর সাথে স্বামীর অনেক কথা থাকে কিন্তু বলার উপায় নাই।'

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি এবং বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। তাই জেলে যেকোন ধরনের মানুষ তাকে নেতা হিসেবে সম্মান করতো। কষ্টের কথা বলে কাঁদতো। বঙ্গবন্ধুকেও যে আটক করে তাদের কাছে রাখা হয়েছে এটা তারা বুঝতে চাইতো না। তিনিতো নেতা। সবাই বিশ্বাস করতেন তিনি বললেই সব হবে। এ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একজন জননেতা বিশ্বনেতায় রূপ নিয়েছিলো। জেল-জীবনের শুরু থেকেই সিপাহি, কয়েদিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বেশ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে ছিল। যে কারণে সবাই তাঁর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করেছে। তিনিও জেলের আইন মেনে চলতেন, তবে সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতেন। সাধারণ মানুষকে বঙ্গবন্ধু সব সময় দেখেছেন মমতা ও সহানুভূতির চোখে, লুদু ওরফে লুৎফর রহমানের প্রতি তিনি যে স্নেহ দেখিয়েছেন, তা এককথায় নজিরবিহীন। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা লুদুদের সঙ্গে কথাও বলবেন না। কারণ লুদু একজন পেশাদার চোর। এই সমাজ সামাজিকতা যে লুদুকে চোর বানানোর জন্য দায়ী এটা এ সমাজকে বোঝাবে কে? বঙ্গবন্ধু বুঝতেন এ সংকটের কথা। লুদু কারো ভালোবাসা পায়না। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা যে লুদু চোরকে ভালোবাসা দেয়। তার কি আর ভালোবাসার সংকট থাকে? বঙ্গবন্ধু লুদুর সঙ্গে যে সদয় আচরণ করেছেন তাতে মনে হয়েছে 'অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়' তিনি আক্ষরিক অর্থে তা বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

'আমি লিখছি এর জীবনের ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজব্যবস্থার চিত্র, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে, যারা গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করবেন। তারা বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজের দুরবস্থা এবং অব্যবস্থায় পড়েই মানুষ চোর ডাকাত পকেটমার হয়। আল্লাহ কোনো মানুষকে চোর ডাকাত করে সৃষ্টি করে না।'

বুক তার বাংলাদেশ

জেলে বন্দি থাকা অবস্থায়ও বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পড়তেন, পত্রিকা পড়তেন। খুটিনাটি সব খবর রাখলেও তার মূল খবর ছিলো নিজের দল মানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের খোঁজ-খবর রাখা। সার্বক্ষনিক এ কাজটা তিনি করতেন। এছাড়াও কোন ইস্যুতে তার দল কী ধরনের সংগ্রাম করলো, মিজান চৌধুরী কী বিবৃতি দিলো সে বিষয়ে তার মতামতও তিনি লিখে রাখতেন তার ডায়রীতে। এছাড়াও গণনেতা হিসাবে জেলের ভেতরের সব অপরাধী বা কয়েদী সব বাঙালীর সন্তান তিনি এমনই ভাবতেন। তাই কাকে কোথায় রাখা হল, খাবারের, মশারির ব্যবস্থা করা, আবার কাউকে কষ্ট দিলে প্রতিবাদ করেছেন। বেগম মুজিব জেলের ভেতরে খাবার পাঠালে সেটা ছিলো উৎসবের বিষয়। সে খাবার সবাইকে দিয়ে তারপর তিনি খেতেন। নিজের শারীরিক অসুস্থতা, খাবারের কষ্ট, ঘুমের কষ্ট, বাবা-মাসহ সন্তানদের চিন্তা, আর্থিক সংকট তারপরও তিনি ছিলেন সবার আশ্রয়স্থল, যেন বটবৃক্ষ। সব মানুষকে তিনি বুকে ধারন করতেন। কিন্তু চীনপন্থী ন্যাপ নেতা মশিয়ুর রহমান ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এর জবাবে বঙ্গবন্ধু ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন:

"জনগণ জানে এই দলটির কিছু সংখ্যক নেতা কিভাবে কৌশলে আইয়ুব সরকারের অপকর্মকে সমর্থন করছে। আবার নিজেদের বিরোধী দল হিসেবে দাবি করে এরা জনগণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। এরা নিজেদের চীনপন্থী বলেও থাকেন। একজন একদেশের নাগরিক কেমন করে অন্য দেশপন্থী, প্রগতিবাদী হয়?"

হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের পাশাপাশি গর্ভনর মোনায়েম খান গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও হরণ করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"এটা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়, জনগণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম।"

১৯৬৬ সালের ৭ জুন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কম ছিল না, একই সঙ্গে এদেশের জনগণের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল সীমাহীন। এই সীমাহীন বিশ্বাস নিয়ে তিনি ছুটে চলেছেন দুর্নিবার। ৭ জুন বাঙালির ইতিহাসে একটি উজ্বল দিন হিসেবে বা বাঙালির সংগ্রামের মাইলফলক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আইয়ুব-মোনায়েম চক্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আপামর জনতা এদিন রাজপথে নেমে আসে। নজিরবিহীন হরতাল পালন করে। সে খবর জেলখানায় বসে পত্রিকায় পড়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আব্দুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস, রিক্সা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলছে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকতে দেওয়া হয়নি। অশান্তি সৃষ্টি করেছে, যাদের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল সরকারের আইনশঙ্খলা বাহিনী। টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ করে ক্ষান্ত হয়নি; গুলি করে সরকারি হিসাবে ১০ জনকে হত্যা করেছে। গ্রেপ্তার করেছে অগণিত। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম তো আসে না। নানা চিন্তা এসে পড়ে। এ এক মহাবিপদ, বই

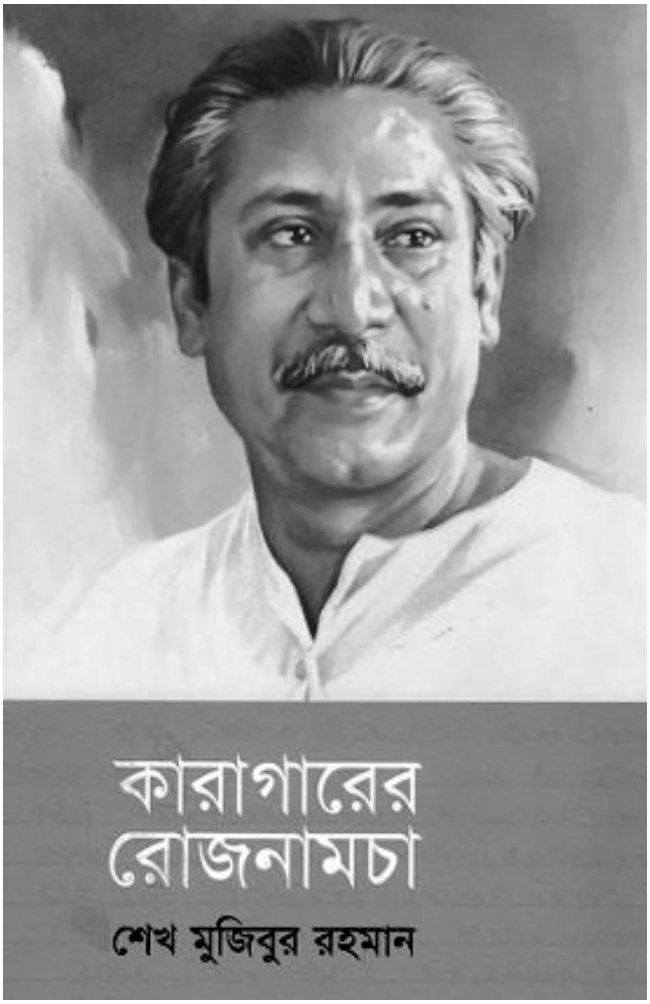

পড়ি, কাগজ উল্টাই, কিন্তু তাতে মন বসে না।"

বঙ্গববন্ধু জেলে থাকতেই তিনি যে সংগ্রামের বীজ বপন করেছেন তা দিন দিন পরিপুষ্ট হচ্ছিলো। বাঙালি ৬ দফার দাবিতে কোন আপসে আসছিলো না। লাঠি, গুলি টিয়ার গ্যাস দিয়ে বাঙালকিে রোধ করা যাচ্ছিলো না। দিন যতো যাচ্ছিলো সরকার ততোই আতংকিত হচ্ছিলো। যে কারনে ১৩ জুন তারিখের মধ্যে ৯,৩৩০ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে বন্দি করা হয়। এর পূর্বে আওয়ামী লীগের প্রায় ৩,৫০০ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার করা হয় ১০ মের মধ্যে। সরকারি চরমপন্থার অংশ হিসেবে ১৫ জুন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন ১৬ জুন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ এবং পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন বলে 'নিউনেশন প্রেস' বাজেয়াপ্ত করে সরকার। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

'মানিক ভাইকে যেখানে রেখেছে, সেখান থেকে খবর আনা খুবই কষ্টকর। এত বড় আঘাত পেলাম তা কল্পনা করতে বোধ হয় অনেকেই পারবে না। প্রথম থেকেই এই কাগজের (ইত্তেফাক) সাথে আমি জড়িত ছিলাম।'

সরকারের জুলম-নির্যাতন যতোই তীব্রতর হচ্ছিলো শংকিত সরকার আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও ভাঙনের ষড়যন্ত্র করে। সরকারের এই হীন চেষ্টাকে ভিন্ন রূপ দিতে ছয় দফার আন্দোলনের বিকল্প হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন গঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু জেলে বসেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ছয় দফার আন্দোলন নসাৎ করার জন্যই এসব আয়োজন। তিনি লিখেছেন:

'৬ দফার জন্য জেলে এসেছি, বের হয়ে ৬ দফার আন্দোলনই করব। যারা রক্ত দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসনদ ৬ দফার জন্য, যারা জেল খেটেছে ও খাটছে তাদের রক্তের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে আমি পারব না।'

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও কারাগারের ফটক থেকেই সেনাবাহিনী তাকে আবার গ্রেপ্তার করে। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসের ১০ নং কক্ষে তাঁকে বন্দি করা হয়। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলার এক নম্বর আসামি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এমনকি বন্দি অবস্থায় তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে বাধ্য হয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন। যদিও মামলা চলাকালীন ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জবানন্দিতে বঙ্গবন্ধু নিজেকে নির্দোষ দাবি করে লেখেন:

'আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে আস্থাশীল নই। আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য সব অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। বিভিন্ন গবেষণা এবং স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু মূলত কৌশলগত কারণে তাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কর্ণেল শওকত আলী তাঁর 'সত্য মামলা আগারতলা' গ্রন্থে লিখেছেন: 'অভিযুক্তদের সঙ্গে বসে অভিযোগনামা শুনতে শুনতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, বঙ্গবন্ধু আমাদের সার্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন এবং সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন।'

বাংলার মানুষের বহুকালের স্বপ্ন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে সামনে রেখে তিনি একের পর এক সংগ্রাম করে গেছেন। বলা যেতে পারে এই ভূখন্ডের মানুষের স্বাধীনতার জন্য তিনি কোনো পন্থাই বাদ দেননি। বাবা-মা, পুত্র-কন্যার ভালবাসা বিসর্জন দিয়েছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। লড়াই সংগ্রাম করে জনগন তাঁকে আইয়ুবের কারাগার থেকে মুক্ত করে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। সেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির অযুত বছরের নেতা একথা অনস্বীকার্য।

নিরব সেলের অন্দরে

বঙ্গবন্ধু কারান্তরালে। তবু শাসকচক্র নির্ঘুম। কারন বঙ্গবন্ধু জনতার স্বপ্নে আলোর যে বিচ্ছুরণ মিশ্রিত করেছিলেন তা ছোটখাটো বিষয় নয়। মুক্তিপাগল মানুষ নিত্য নতুন ঘটনার জন্ম দিতে থাকে। মোনায়েম খানের গায়ের ঝাল তাতেও মেটেনি। জেলে বঙ্গবন্ধুকে আইনানুগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তাকে কতো বেশি কষ্ট দেয়া যায় তার অলিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন গর্ভনর। যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে জেল আইন ভঙ্গ করে Solitary Confinement -এ রাখা হয়। কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখা হয় তাঁকে। কৌতুক করে লিখেছেন:

'আমার অবস্থা হয়েছে, 'পর্দানসিন জানানা'র মতো কেউ আমাকে দেখতেও পারবে না, আমিও কাউকে দেখতে পারব না। কেউ কথা বলতে পারবে না, আমিও পারব না।'

বঙ্গবন্ধুকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে তার বিবরণ দিলে যে কোন মানবিকতা হার মানবে। জনগনের এই অবিসংবাদিত নেতাকে জেলে এমনভাবে রাখা হয়েছিলো যাতে তিনি পাগল হয়ে যান বা মারা যান। তার আগে আওয়ামীলীগের এক নেতাকে এমন করা হয়েছিলো, যে তিনি পাগল হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

বঙ্গবন্ধুকে যে সেলে রাখা হয়েছিলো তার-দক্ষিণে ১৪ ফুট উঁচু দেওয়াল, উত্তর দিকে ৪০ সেল, যেখানে পাগলদের রাখা হয়েছে। পূর্ব দিকে ১৫ ফুট দেওয়াল ও নতুন ২০ এবং পশ্চিমে থাকে এক ফেরারী আসামি, ছয় সেল ও সাত সেল। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একাকী বন্দি জীবনে অনেকের পক্ষে শারীরিক-মানসিক সুস্থতা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে না। প্রায় তিন বছর এক দুঃসহ নির্যাতন ভোগের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। প্রবল মানসিক শক্তির জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'যতই কষ্টের ভিতর আমাকে রাখুক না কেন, দুঃখ আমি পাব না। এরা মনে করেছে বন্ধু শামসুল হককে (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক) জেলে দিয়ে যেমন পাগল করে ফেলেছিল। আমাকেও একলা একলা জেলে রেখে পাগল করে দিতে পারবে। আমাকে যারা পাগল করতে চায় তাদের নিজেদেরই পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

ঋণ-সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয় বিস্তারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। পাকিস্তান-

ভারত যুদ্ধের পর মার্কিন সাহায্য নেওয়ার অসম্মানজনক প্রক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে লিখেছেন:

'নিজের দেশকে এত হেয় করে কোনো স্বাধীন দেশের সরকার এরূপভাবে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। শুধু সরকারকে আপমান করে নাই, দেশের জনগণ ও দেশকেও অপমান করেছে। ভিক্ষুকের কোনো সম্মান নাই।'

তিনি বরং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন। জনগণের স্বার্থে সমাজতন্ত্র কায়েমের পক্ষে মত দিয়েছেন। ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সোভিয়েত সহায়তায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেছেন: 'রুশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব কায়েম হউক এটাই আজ সাধারণ মানুষের কামনা।'

তবে চীনের ভূমিকা নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ঠ ছিলেন। পাকিস্তানের পিকিংপন্থীদের আইয়ুবের দালালি এবং পুঁজিবাদের সমর্থক জেনারেল আইয়ুবের প্রতি চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সমর্থন তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে। ১৯৬৬ সালের ২৯ জুন চীনের প্রধানমন্ত্রীর রাওয়ালপিন্ডি সফর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু চীনের নীতির খোলামেলা সমালোচনা করেছেন:

'আপনার' জনগণের মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, আর যে সরকার (আইয়ুব সরকার) জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া আপনাদের উচিত না। এতে অন্য দেশের ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও আপনাদের পথ এক না হওয়াই উচিত।'

আমার আব্বা-মার অসুস্থতার কথা শুনলে আমি পাগল হয়ে যাই, কিছুই ভালো লাগে না। খেতেও পারি না, ঘুমাতেও পারি না, তারপর আবার কারাগারে বন্দি।"

বঙ্গবন্ধু-১০

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্নেহময়ী মাকে কথা দিয়েছিলেন ১৯৬৬ সালের ১৩ মে গ্রামের বাড়িতে যাবেন। কিন্তু ৮ মে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তান সরকার। মায়ের অসুস্থতার সংবাদ বঙ্গবন্ধুকে ভীষণ ব্যাকুল করে তোলে। মাতৃভূমির ডাকে ৬ দফার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জন্মদাত্রী মায়ের ডাকে সাড়া দিতে পারেননি।

'আব্বা বালি চল'

বঙ্গবন্ধুর কারা-জীবনের বাইরেও তিনি যে একজন স্নেহময় পিতা তা রোজনামচার বিভিন্ন স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। শারীরিক, মানসিক নির্যাতনে কষ্টের শিকার অথবা অপমান, অবহেলার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর বন্দি থাকাকালীন অবস্থায়ও তাঁর সংসার, সন্তান, সহধর্মিনীর প্রতি খুবই যত্নশীল, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী এবং রোজনামচা প্রকাশের পূর্বে অন্ধকারেই ছিল সেই ইতিহাস। জেলের মধ্যে থাকাকালে বিদূষী ফজিলাতুন্নেছা মুজিব দেখা করতে আসতেন। কতো শত কথা হতো বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পত্নী রেনুর সঙ্গে- যে কথা তিনি

> *বঙ্গবন্ধুকে যে সেলে রাখা হয়েছিলো তার-দক্ষিণে ১৪ ফুট উঁচু দেওয়াল, উত্তর দিকে ৪০ সেল, যেখানে পাগলদের রাখা হয়েছে। পূর্ব দিকে ১৫ ফুট দেওয়াল ও নতুন ২০ এবং পশ্চিমে থাকে এক ফেরারী আসামি, ছয় সেল ও সাত সেল। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একাকী বন্দি জীবনে অনেকের পক্ষে শারীরিক-মানসিক সুস্থতা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে না। প্রায় তিন বছর এক দুঃসহ নির্যাতন ভোগের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।*

'পাকিস্তানের আপন মার পেটের ভাই'

রোজনামচা পড়তে গিয়ে পাঠক বঙ্গবন্ধুর মার্জিত রসবোধের পরিচয় পান। সুযোগ পেলেই তিনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন। ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ করে বঙ্গবন্ধু 'ইন্দোনেশিয়াকে পাকিস্তানের আপন মায়ের পেটের ভাই' বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তান সরকার ইন্দোনেশিয়াকে ১৪ কোটি টাকা ঋণদানের ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধু ব্যঙ্গ করে লিখেছেন:

"এভাবেই আমরা ইসলামের খেদমত করছি। কারণ না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো তো ইসলামের হুকুম। দয়ার মন আমাদের! এমন প্রেম-ভালবাসাই তো আমাদের নীতি হওয়া উচিত! কাপড় যদি কারও না থাকে তাকে কাপড়খানা খুলে দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসবা। আমাদের সরকারের অবস্থাও তাই।"

'আমাকে দেখতে আয়, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না'

বঙ্গবন্ধুর মা সায়েরা খাতুন খুলনা থেকে ছেলেকে ফোনে জানালেন: 'তুই আমাকে দেখতে আয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।'

মায়ের আকুল আহবানে কেউ কি সাড়া না দিয়ে পারে? বঙ্গবন্ধু বাবা-মা দুজনেরই অতি আদরের 'খোকা'। বাবা-মাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে বাবা-মায়ের খোকা তাদের ভাগ্য কতোটা সুপ্রসন্ন তা বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা- ভক্তির মধ্য দিয়ে বিম্বিত হয়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমি জানি না আমার মতো এত অন্য কোনো ছেলে পেয়েছে কি না! আমার কথা বলতে আমার আব্বা অন্ধ। আমারা ছয় ভাইবোন। সকলে একদিকে, আমি একদিকে। খোদা আমাকে যথেষ্ট সহ্যশক্তি দিয়েছে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। জেলে মায়ের সঙ্গে যেতেন দুবছরের ছোট্ট শিশু রাসেলও। বাবাকে কাছে পাওয়া, সর্বোপরি পিতৃস্নেহ কে না বোঝে? রাসেলে অস্ফুট কণ্ঠে তাই দাবি তোলে: "আব্বা বালি (বাড়ি) চল।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর আদরের সন্তানকে কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। তিনি লিখেছেন:

'দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখে নাই। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।'

আর্থিক সংকট

বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নানা সময়ে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়েছে। একথা আজ যে কারো বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা আর্থিক কষ্টে ভোগেন। আজকের বাস্তবতায় এটাকে রূপকথা মনে হবে। তারপরও এ কথাই সত্যি। সমস্ত সংকটে ভরসা ছিল পিতা শেখ লুৎফর রহমান আর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন্নেছা। পারিবারিক ব্যয় হ্রাসের জন্য বেগম মুজিব বললেন: 'যদি বেশি অসুবিধা হয় নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে ছোট বাড়ি একটা ভাড়া করে নিব।'

বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দিতে গিয়ে বললেন: 'পারিবারিক সম্পদের আয় থেকে সংসার চলে যাবে।'

বেগম মুজিব সুস্পষ্টভাবে বললেন: 'চিন্তা তোমার করতে হবে না।'

বাস্তবে বঙ্গবন্ধু হাড়ে মজ্জায় রাজনীতিবিদ। আন্দোলন, সংগ্রাম, জনগণ, দেশ ছাড়া তাঁর আর কোন জগৎ ছিলো না। এটা সম্ভব হয়েছিলো ফজিলাতুন্নেছা

মুজিবের মতো এক বিদূষী নারীর কারনে। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থদ্বয়ে অগণিত স্থানে তাঁর সহধর্মিনীর প্রতি গভীর ভালবাসা, আস্থা, বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে বেগম মুজিবের ধৈর্য্য, ত্যাগ ও অবদানের বিবরণ দিয়েছেন। প্রায় ৪০ বছরের দাম্পত্য জীবনে বেগম মুজিব ভালবেসে তাঁর স্বামীর সংগ্রামমুখর, ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে সঙ্গি ছিলেন। তবে বেগম মুজিব সবসময় তাঁর স্বামীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। গোপালগঞ্জ থানায় বেগম মুজিব তাঁর স্বামীকে কিছু কথা বলেছিলেন যা বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন:

'রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, 'জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোট বেলায় বাবা-মা মারা গেছেন তোমার কিছু হলে বাঁচব কী করে?'

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী যেমন তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন আবার বঙ্গবন্ধুও বেগম মুজিবের ওপর কোনো অংশে কম নির্ভরশীল ছিলেন না। শুধু পারিবারিক জীবন নয় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে ঝুঁকি ও সংকটকালীন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেগম মুজিব নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছেন।

'বড় মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব'

বঙ্গবন্ধুর তিন পুত্র, দুই কন্যার মধ্যে কে তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন তা আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। কারণ বঙ্গবন্ধুর এযাবৎ প্রকাশিত কোনো রচনায় এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই। আত্মজীবনীতে তিনি সন্তানদের মধ্যে সবেচেয়ে অধিকবার উল্লেখ করেছেন শেখ হাসিনা সম্পর্কে, অন্যদিকে রোজনামচায় সব চেয়ে বেশি উঠে এসেছে রাসেল প্রসঙ্গ। রাসেল নিতান্তই শিশু, আদর-আবদার বেশি থাকাটা স্বাভাবিক। তবে বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত রচনাতে জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনার প্রতি একটু বেশি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

শেখ হাসিনার বিয়েতে প্রথমে বঙ্গবন্ধু সম্মত হননি। তিনি চেয়েছিলেন বিএ পাস করার পর কন্যার বিয়ে দেবেন। তবে বেগম মুজিবের আগ্রহের কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হন। কিন্তু কন্যাও বেঁকে বসেছিলেন দুটো কারণে। প্রথমত, তাঁর পিতা তখন কারাগারে বন্দি, দ্বিতীয়ত, বিয়ের আগে বিএ পাস করতে চান। শেষ পর্যন্ত কন্যার সম্মতি আদায়ের দায় পড়ল পিতার ওপর, তিনি শেখ হাসিনাকে বললেন:

'মা আমি জেলে আছি, কতদিন থাকতে হবে, কিছুই ঠিক নাই। তবে মনে হয় সহজে আমাকে ছাড়বে না, কতগুলি মামলাও দিয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে চলেছে। তোমাদের আবারও কষ্ট হবে। তোমার মা যাহা বলে শুনিও।'

'পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখেছে, এখানে নামাজ পড়তেই হবে'

এটা পাকিস্তানি শোষণ-ত্রাশনের নমুনা। পাকিস্তানি শাসকবর্গ কেবল ভাষা, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আরচণতো করেছেই, এমনকি ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও জবরদস্তি করেছে। ১৯৬৭ সালের ঈদ-উল-ফিতরের ঘটনা। হঠাৎ রাত ১০টায় সরকার ঘোষণা দিল, পরের দিন ১২ জানুয়ারি সারা পাকিস্তানে ঈদ হবে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। সিপাহি, জেল কর্মচারী তারা রোজা ভাঙতে রাজি হয়নি। তাদের ন্যায্য কথা:

'চাকরি করে বলে নামাজও সরকারের ইচ্ছায় পড়বে নাকি?'

১১ জানুয়ারি বেগম মুজিব সন্তানদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে যান। সন্তানরা কেউ ঈদের কাপড় নেবে না। কারণ বাবাকে কারাগারে রেখে ঈদের আনন্দ হয় কী করে? তারপরও তিনি বেগম মুজিবকে বললেন ভালোভাবে ঈদ উদযাপনের জন্য, না হলে বাচ্চাদের মন ছোট হয়ে যাবে। এখানে বঙ্গবন্ধু শুধুই একজন পিতা। যে তার সন্তানদের ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাননা। যা হোক, ঈদ পালনের সরকারি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুও ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন:

'শুনলাম পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি লোক চাঁদ দেখেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নতি হলে পূর্ব বাংলার উন্নতি হয়! হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখেছে, এখানে নামাজ পড়তেই হবে। আমাদের (কয়েদিদের) আবার নামাজ কী! তবুও নামাজে গেলাম, কারণ সহকর্মীদের সাথে দেখা হবে।'

'পাখি দুইটা যে আমার কত বড় বন্ধু'

বঙ্গবন্ধু যে কতোটা প্রকৃতি নিসর্গ প্রেমিক ছিলেন তা বলে শেষ করার নয়। কারাগারের চার দেয়ালে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু নিসর্গের বিবরণ দিয়েছেন তার সাহিত্যমূল্য কম নয়। হৃদয় ছুঁয়ে যায় তার বর্ননা। তার একাকীত্বের মাঝে এই প্রাকৃতিক অবলম্বন ছোট বিষয় না। রোজনামচায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন প্রকৃতির নানা রূপের বিবরণ। ঘুরেফিরে এক জোড়া হলুদ পাখির জন্য তাঁর ব্যাকুলতার কথা লিখেছেন।

এ ছাড়া চড়ুই, কাক ও কবুতর নিয়েও আলোচনা আছে। তিনি একটা মুরগি পালতে শুরু করেছিলেন। মুরগির হাটা, চলা, খাওয়ার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। এই মুরগীর মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটার মধ্যে তিনি বাঙালির দৃঢ়চেতা চরিত্রের সন্ধান করেছেন। তারপর একদিন সেই মুরগিটা মারা যায়। মুরগীর মৃত্যুতে তিনি শিশুর ন্যায় কষ্ট পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তার সেলের মধ্যে সুন্দর একটি ফুলের বাগান তৈরি করেছিলেন। তার পরিচর্যা করতেন। নির্জন সেলে বসে শুনতেন হরেকরকমের পাখিদের গান। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃতি প্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালে প্রথম এক জোড়া হলদে পাখি দেখেছিলেন। আট বছর পরে আবার হলদে পাখি দুটিকে দেখার তীব্র বাসনা নিয়ে তাঁর চোখ দুটি গাছের ভেতরে খুঁজে ফিরেছে সেই প্রিয় পাখি দুটি। এর মধ্য দিয়ে নিসর্গের প্রতি তার অপার টান তাকে অনেক মানবিক করে তুলেছে। তার প্রিয় একজোড়া হলুদ পাখির ফিরে আসার ব্যাকুলতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

'বড় ব্যথা পাব ওরা ফিরে না আসলে। পাখি দুইটা যে আমার কত বড় বন্ধু যারা কারাগারে একাকী বন্দি থাকেন নাই তারা বুঝতে পারবেন না। আমাকে তো একেবারে একলা রেখেছে। গাছপালা, হলদে পাখি, চড়ুই পাখি আর কাকই তো আমার বন্ধু এই নির্জন প্রকোষ্ঠে।'

'কলম ফেলে দিন। লাঠি, ছোরা চালান শিখুন'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে তার যে ধারনা তার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চরিত্র আমাদের আহত করে,আশাহত করে, হতাশ করে। কারন বঙ্গবন্ধু একদিন যে আশংকা করেছিলেন আজকে সে কথাই সঠিক। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের কেন্দ্র বলে মনে করতেন। যে কারণে মুক্ত চিন্তা ও সৃজনশীলতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে তিনি বেশ গুরুত্ব দিতেন। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপে তিনি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেননি। কিন্তু শিক্ষকমণ্ডলী প্রতিবাদ না করায় হতাশ হয়ে লিখেছেন:

'কলম ফেলে দিন। লাঠি, ছোরা চালান শিখুন, আর কিছু তেল কিনুন রাতে ও দিনে যখনই দরকার হবে নিয়ে হাজির হবেন। লেখাপড়ার দরকার নাই। প্রমোশন পাবেন, তারপরে মন্ত্রীও হতে পারবেন।'

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে সংসদে আইন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. এম এন হুদার (মীর্জা নূরুল হুদা) প্রতি ইঙ্গিত করে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হওয়ার কথা বলেছেন। ড. হুদা ১৯৬৫-৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ৬ দফা ও আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

'একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন, হঠাৎ একজনের দয়ায় মন্ত্রী হয়ে রাজনীতিবিদ হওয়ার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রিত্বের লোভে ভদ্রলোক এত নিচে নেমে গিয়েছেন যে একটা দলের বা লোকের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না।'

উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বিচারপতি সায়েম তাঁকে উপদেষ্টা, জিয়াউর রহমানের সময়ে অর্থমন্ত্রী এবং বিচারপতি সাত্তার তাঁকে উপ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের বিরোধীতার 'পুরস্কার' ড. হুদা পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে যথাযথভাবে পেয়েছিলেন!

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের আলোচনা এই পরিসরে করা অত্যন্ত দুরূহ। অনেক গুন্তত্বপূর্ণ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আলোকপাত করেছেন। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অত্যন্ত গুন্তত্বপূর্ণ পর্বের (১৯৬৬-১৯৬৯) দিনলিপি এই গ্রন্থ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই বইয়ের লেখার গতি এবং অনেক বাস্তবতা অনুভব করলে চোখ ভিজে যায়। একজন মহান নেতা, একজন আবেগী স্বামী, একজন পিতা, একজন নিসর্গবিদ, সাহিত্যমনা বঙ্গবন্ধুকে আমরা এবইয়ে দেখতে পাই। ১৭ বছরের জেল জীবনের যে ত্যাগ- তীতিক্ষার ইতিহাস আছে এবইয়ের পরতে পরতে। এই রোজ নামচার অনেক জায়গায় তিনি নিজেকে আরো বড়ো করে দেখাতে পারতেন। কিন্তু তখনকার রাজনীতিবিদদের যে রাজনৈতিক দর্শন তাতে মিথ্যাচার, অসততা ছিলো না। যেটা শহীদুল্লাহ কায়সারের রাজবন্দীর রোজনামচায়ও দেখা যায়। এখনকার রাজনীতিবিদদের এ বইয়ের দ্বারা সততা- নিষ্ঠার জায়গাটা আরো পোক্ত হবে। উপকার হবে দেশের মানুষের। জেগে ওঠা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস জানতে এ বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

লেখক: সাংবাদিক

পাকিস্তানের কারাগারে
বঙ্গবন্ধু

মূল : রবার্ট পেইন, অনুবাদ : ওবায়দুল কাদের

কার শোকে যে পাখপাখালি বৃক্ষ চন্দ্র তারা
সন্ধ্যা সকাল মাতম করে কাঁদে টুঙ্গিপাড়া
টুঙ্গিপাড়া কাঁদে আমার কাঁদে বাংলাবাসী–
কোন সে দানব কাড়লো আমার মায়ের মুখের হাসি।

আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। বাঙালির বুক ফাটা মাতমে প্রতিশোধের দাবদাহে জ্বলে ওঠার মাস। এই আগস্টের ঘৃণিত কালরাত্রিতে আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রাণপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

এ যাবৎকালে সারাবিশ্বে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানকেই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে বা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু একজন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা মানে শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধানকেই হত্যা নয়, বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নসাধ, গৌরাবান্বিত গর্বগাথা হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে আমাদের সকল গর্বিত অর্জনকেও হত্যা করা হয়েছিল পঁচাত্তরের মধ্যআগস্ট কালরাত্রিতে।

আমাদের অনেক জ্ঞানীগুণী বলে থাকেন, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশি শক্তিবান ও তেজদীপ্ত। আর তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রবল প্রজ্ঞাবান গুণীদের মুক্তবুদ্ধিচর্চার অমর সাক্ষী বইয়ের মাধ্যমে। মানব ইতিহাসে এ যাবৎ কালে সবচেয়ে গৌরাবান্বিত যে বিষয়টিকে বুকে ধারণ করে আমরা শক্তি ও সাহস পাই তা হলো বই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতা ও বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাকালে আমরা দেখতে পাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বই সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে যে মহান মানুষটিকে নিয়ে তিনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের হাজার বছরের সূর্যসন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আজ সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো এত অবক্ষয়, পতনের ভয়ঙ্করী আঁধার সমগ্র জাতি যখন হতাশার কালাগ্নিদাহে দিশেহারা তখনো কিন্তু আমরা আশার আলো দেখতে পাই একটি বিষয়ে– সেটি হলো প্রতিবছরই অসংখ্য গ্রন্থ রচনা হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রামাণ্যগ্রন্থ।

'পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু' উপন্যাসটি পড়ে আমার কেন জানি বারবার মনে হয়েছে সকল দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধুর ভক্তদের এই গ্রন্থটি পড়া দরকার। আমার আরো মনে হয়েছে, পাকিস্তানের সে সময়ের নেতা ভুট্টো সাহেব যদি ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জনের পর (বঙ্গবন্ধু তখনো জানেন না আমাদের বিজয়ের সংবাদ) বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালী কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ না দিতেন তা হলে আমরা হয়তো বঙ্গবন্ধুকে এত সহজে ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ। ভুট্টো স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে জেল গভর্নর হাবিব আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে যেন শহর থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টোর আদেশ মোতাবেক জেলার হাবিব শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে নিসর্গমণ্ডিত এলাকায় বঙ্গবন্ধুকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাসায়। এসব মর্মস্পর্শী কথামালায় 'পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু' উপন্যাসটি বারবার পড়তে মন চাইবে এবং জানা-অজানা কথামালায় শিউরে উঠবে মন।

মুজিব আমার মেঘলাকাশে ঝলমলে এক রবি
বাঙালিদের মহামানব যুদ্ধজয়ের কবি।
মুজিব আমার রক্তে জাগায় বিপ্লবেরই গান
এক মুজিবের নামে জাগো লক্ষ-কোটি প্রাণ।

দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুকে এভাবেই চির জাগরূক করে রাখতে চায়।

যে মহৎ মানুষটি মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ

'পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু' উপন্যাসটি পড়ে আমার কেন জানি বারবার মনে হয়েছে সকল দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধুর ভক্তদের এই গ্রন্থটি পড়া দরকার। আমার আরো মনে হয়েছে, পাকিস্তানের সে সময়ের নেতা ভুট্টো সাহেব যদি ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জনের পর (বঙ্গবন্ধু তখনো জানেন না আমাদের বিজয়ের সংবাদ) বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালী কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ না দিতেন তা হলে আমরা হয়তো বঙ্গবন্ধুকে এত সহজে ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ।

ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে নির্মম ট্র্যাজেডির গল্পগাথা খুব দক্ষতার সাথে তুলে এনেছেন তার দ্য টর্চারড অ্যান্ড দ্য ডেমনড (The Tortured and The Damned) প্রামাণ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। ইংরেজি ভাষায় এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমনন্ত্রীী ওবায়দুল কাদের।

এ উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যাবে বাঙালি জাতির মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ কারা জীবনের বীভৎস বর্ণনা যে কোনো পাষাণ হৃদয় আবেগাপ্লুত না হয়ে পারবে না। যে উপন্যাসটির প্রতি পাতায় পাতায় অসংখ্য ঘটনার প্রাণস্পর্শী শব্দ প্রয়োগে যে কোনো পাঠককে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর রণক্ষেত্রের বর্বরোচিত আক্রোশের কথা যেমন মনে করিয়ে দেবে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পাক-জান্তাদের হিংস্র আক্রোশে দুঃসহ মনোযাতনার নির্মম কষ্ট কখনো মনে করিয়ে দেয়। সকল অবর্ণনীয় চিত্রকল্পও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এত নির্যাতন নিপীড়নের পরও কিন্তু কোটি বাঙালির প্রাণের মানুষটিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর সাহস পায়নি অথচ স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক পথভ্রষ্ট কুলাঙ্গারের হাতে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে।

করেছিলেন আর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমরা আমার লাশটি বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দেবে। আমি বাঙালি। বাংলা আমার প্রাণ। আমি বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তোমাদের মৃত্যুভয়কেও পরোয়া করি না। আমরা মরতে শিখেছি তাই বিজয় আমাদের অনিবার্য। যে মানুষটি এমন লৌহদীপ্ত অঙ্গীকার, বুকে ধারণ করে বছরের পর বছর অন্ধকারাগারে বন্দি হয়েও স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালির মহামুক্তির। একাত্তরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর দেশ যখন স্বাধীন হলো অথচ তিনি তখনো পাননি তাঁর দেশের স্বাধীনতা লাভের শুভ সংবাদটি। তখনো বঙ্গবন্ধু মিয়ানওয়ালী কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায় বিষয়টি যেভাবে উঠে এসেছে:

১৮ ডিসেম্বর; একাত্তর। রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন। মনোরম বিশাল ভবনে প্রেসিডেন্টের সুসজ্জিত ডেস্ক। ডেস্কের ওপর রূপোর ফ্রেমে আঁটা তিনটি ঝকমকে ছবি; মাও সেতুং, যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন ও ইরানের শাহের। এরা বরাবরই পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্বের সমর্থক ও আশীর্বাদক।

টেবিল চাপড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তর্জন-গর্জন করে ওঠেন ইয়াহিয়া খান; 'না হতে পারে না।'

ক্ষোভে দুঃখে তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। ঠিক এমন সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের টেলিফোন। নিক্সন গভীর সহানুভূতি জানালেন পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে। ইয়াহিয়ার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি। নিক্সনের সান্ত্বনা পেয়ে জঙ্গিকর্তা আপাতত চাঙ্গা।

আরে হ্যাঁ, কর্নেল আমাকে একটা ফাইল দেখাতে হয় যে, (রাজবন্দি) শেখ মুজিবুর রহমানের ফাইলটা বড্ড দরকার। আমার মনে হয়, তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার উপযুক্ত সময় এখনই।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন মিয়ানওয়ালী কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। তিনি তখনো জানেন না তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুজিব শুধু জানেন, মৃত্যু দুয়ারে করাঘাত করছে। প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে তাঁর আর বুঝি ফেরা হলো না।

দিনের পর দিন গড়াতে লাগল। পর্বতমালায় ঘেরা মিয়ানওয়ালী কারাগার। প্রায়শ শিলাবৃষ্টি নেমে আসত। ধূসর মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে। তুষারাবৃত্ত পাহাড়। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পাতলা বিবর্ণ একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বন্দি মুজিবের দিন কাটত।

একদিন প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো ঝড়। সাথে অস্বাভাবিক বারিপাত। আকাশজুড়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর কানফাটা গর্জন চারদিকে। দু'টো এক্সপ্রেস ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের বিকট আওয়াজের মতোই। সেলে নেমে আসে রাতের মতো গাঢ় অন্ধকার। বৃষ্টির জল বাতাসে ধাক্কা খেয়ে জানালা দিয়ে আছড়ে পড়ছিল। কনকনে ঠাণ্ডায় বন্দি মুজিব কোঁকাচ্ছিলেন। একটা কম্বল শৈত্য প্রতিরোধে মোটেই সহায়ক ছিল না। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এসে বন্দির প্রকোষ্ঠ ভিজিয়ে দিতে উদ্যত।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা কাঁটার মতো মুজিবের মুখে বিঁধতে লাগল। হঠাৎ বজ্রপাতের বিকট একটি শব্দ। যেন ছাদ ভেঙে মাথার ওপর পড়ছে। কয়েক গজ দূরে ততক্ষণে একটা দালানে আগুন ধরে গেছে। সেল থেকে লোকজনের প্রাণভয়ে অস্থির ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুদ্র জানালার পাশে হেলান দিয়ে বাইরের মেজাজ– খারাপ আবহাওয়া ও অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে। (পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৯-১০)

পরের দিন দুপুরবেলা। মুজিব হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর সেলের দশ গজ সামনে কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে ক'জন কয়েদি একটি বড় গর্ত খুঁড়ছে। বন্দি কিছুটা অবাক হলেন। দরকার কাছে এসে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলেন একটা কবর খোঁড়া হচ্ছে। মুজিবের তখন এটাও বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না যে, ওটা তার জন্যই রেডি করা হচ্ছে। সম্ভবত দু'-একদিনের মধ্যেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে চলছে। মুজিব ভাবলেন, হয়তো আজ কিংবা কাল গভীর রাতে ওরা দলে দলে এসে তাঁকে বড় গর্তটির পাশে নিয়ে যাবে। তারপর নির্ঘাত গুলি। প্রাণহীন রক্তাক্ত লাশ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেলের সামনের কবরটা মাটি ভরাট হয়ে যাবে। এরপর শেখ মুজিব নামে কোনো ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একজন প্রহরী তাঁর ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে কানে কানে বলল, কতিপয় কয়েদি আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার চিন্তার কারণ নেই। বন্দি নিরুত্তর। গার্ডের কথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। কারণ কয়েদিরা যেখানে থাকে সে ঘরটাতো সেল থেকে অন্তত পাঁচশ' গজ দূরে। তারা কী করে তাঁকে হত্যা করবে? মুজিব নিশ্চিত হয়ে গেলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে হত্যা করা হবে।

সময়ের চাকা ঘুরে ঘুরতে ছাব্বিশে ডিসেম্বর। গভীর রাত। প্রচণ্ড শীত। সেদিনও মাত্র এক কম্বল শীত নিবারণের সম্বল। শেখ মুজিবুর রহমান ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। রাতভর একটুও ঘুম হয়নি। সময় কেটেছে জেগে জেগে, শুয়ে-বসে। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এলো একটা চলন্ত গাড়ির আওয়াজ। জানালা দিয়ে তাকাতেই লক্ষ করলেন, একটা ট্রাক আসছে ধীরে ধীরে। ট্রাকের হেডলাইটের তেজী আলো সেলে ঢুকে পড়েছে। চোখে ভীষণ লাগছে। ট্রাকটা সেলের সাথে লাগোয়া গার্ড হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল।

ওরা তাহলে এসেই গেল। শেখ মুজিবুর রহমান মনে মনে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের আয়াত পড়তে লাগলেন। তাঁর কানে বাজল বাইরের ছুটোছুটি হাঁকডাক, ফিসফিসানির শব্দ। হঠাৎ ঝন ঝন করে লৌহকপাট খুলে গেল। চারজন সৈন্য ভেতরে ঢুকে শেখকে ঘিরে দাঁড়াল। বন্দি বিছানায় বসে সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ করছেন। মুখে কোনো কথা নেই। চেহারায় স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য। যেন যেকোনো দুঃসংবাদের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত। আশ্চর্য মনোবল শেখ মুজিবের। বিপদের আশঙ্কা করেও অধীর হননি। ভেঙে পড়েননি। সামনে এসে দাঁড়ালেন বেঁটে-খাটো শ্মশ্রুমণ্ডিত জেল গভর্নর হাবিব আলী। মাথায় মিলিটারি ক্যাপ। গায়ে রেইনকোট জড়ানো। হাবিব আলী তার পরিচিত কর্কশ স্বরে বললেন, শেখ, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনি এখন নিরাপদ হাতে পড়েছেন। আমি আপনাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। দেখুন খোদা বড়ই মেহেরবান।

বন্দি নম্র গলায় বললেন, হ্যাঁ বিপদে খোদাই সহায়।

হাবিব খান কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ভয় নেই। আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। ট্রাকে ওঠার সাথে সাথেই কিন্তু শুয়ে পড়বেন। কেন তা পরে বুঝতে পারবেন। তবে শেখ আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার কিছুই হবে না। নিঝুম রাতের মতোই জেলভরা ঝিমুনি।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৮৩-৮৫)

চলতে চলতে মুজিব ভাবলেন; ওরা তাহলে এখনই আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলবে। কিন্তু এতসব ক্লেশকর বন্য প্রস্তুতির কী প্রয়োজন ছিল। ওই সেলের সামনের গর্তের পাশে নিয়েও তো গোপনে মেরে ফেলতে পারত। এত দূরে নিয়ে এলো কেন? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। শৈত্যপ্রবাহের তোড়ে মুজিব থর থর করে কাঁপছিলেন।

কিছুক্ষণ পর মুজিব লক্ষ করলেন পাহাড়ের গা ঘেঁষেই সুন্দর একখণ্ড নিম্নভূমি। সুরম্য বাংলোর সামনে সাজানো বাগান। পিচ করা একটা তকতকে রাস্তাও চোখে পড়ছে। দু'পাশে সারি সারি গাছ– যেন অসংখ্য বৃক্ষতোরণ। কুয়াশাভেজা গভীর রাতে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো করুণ হাসি ছড়াচ্ছিল।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৮৭)

মুজিব ভাবলেন তার রুমে বুঝি ইয়াহিয়া খান আসছেন।

কিন্তু না, ধূসর রঙের স্যুট, নীল টাই পরিহিত অন্য এক চেনা মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছেন। নাচি নাচি ছন্দে। মুখে স্মিত হাসি। শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে জুলফিকার আলী ভুট্টো দাঁড়িয়ে।

শেখ মুজিবুর রহমান কিছুটা অবাক হলেন। তবু একটু এগিয়ে গিয়ে ভুট্টোর আগমনের সাথে সৌজন্যমূলক সায় যোগালেন। দীর্ঘ কারাভোগে শেখের শরীরটা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। ওঠাবসায়ও কষ্ট পান, একটু হাঁটতেই হাঁপিয়ে যান। ভুট্টোকে দেখে তিনি স্বাভাবিক বিনয়ভাব প্রকাশ করলেও তাতে আন্তরিকতার উপস্থিতি নেই। পরিচিত শত্রু মুখোমুখি হলে যেমন ঠিক তেমনই মনের অবস্থা।

আচমকা বন্দির দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় ভুটো বললেন, আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

শেখ মুজিবুর রহমান এবারে না হেসে পারলেন না। ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এটা তাঁর কাছে এমনিতে কোনো উপহাস-পরিহাসের ব্যাপার নয়। এই মুহূর্তে এমনটি হওয়ার মানে সহজেই মুজিবের কাছে যেটা পরিহাসের ব্যাপার তা হচ্ছে ভুট্টো সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়েছেন– যার পরিষ্কার মানে তার কাছে মিলিটারি ডিক্টেটর। কিন্তু ভুট্টোকে তো দেখতে একজন বিচক্ষণ, সম্পদশালী প্রাদেশিক আইনজীবীর মতোই মনে হয়।

ভুট্টোর প্রতি মুজিবের বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা; আপনি তাহলে সামরিক আইন প্রশাসকও হয়েছেন? তার মানে এখানে এখনো এক নায়কতন্ত্রের দাপট চলছে।

ভুট্টো বললেন: না ঠিক ওরকম কড়া নয়। একেবারে স্বাভাবিক সদয় প্রকৃতির।

আপনি দেখবেন কোনো প্রকার হম্বিতম্বি বা বাড়াবাড়ি নেই।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৯৪-৯৫)

৮ জানুয়ারি বাহাত্তর। রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দর। সময় রাত এগারোটা। এয়ারপোর্ট তখন ব্ল্যাক আউট। থমথমে ভাব। পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমান রানওয়েতে দাঁড়িয়ে।

পাইলট, স্টুয়ার্ড, এয়ারহোস্টেস অধীর অপেক্ষায় ভেতরে। যার যার জায়গায় অন্ধকারে বসে।

এভাবে ঘণ্টা তিনেক সময় গড়িয়ে রাত দু'টো। রানওয়ের পাদদেশে একটা নীল বাতিই কেবল একা একা অন্ধকারে মিটিমিটি জ্বলছে। গোটা বিমানবন্দর এলাকা কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা। অভ্যন্তরীণ সব ফ্লাইট করাচি অবতরণের নির্দেশ পেয়েছে। অপরাহ্নে খাস প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে জরুরি নির্দেশ এসেছে, রাত এগারোটা থেকেই বিশেষ বিমানটি রানওয়েতে রেডি হয়ে থাকবে। গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ আসছে ঘন ঘন। সৈন্যরা যার যার সীমানায় টহল দিচ্ছে। চোখ সজাগ। কান খাড়া।

কোনো খবর গোপন করে রাখার মতো শহর নয় রাওয়ালপিন্ডি। হাজার হাজার লোক জেনে গেছে যে, রানওয়েতে অপেক্ষমাণ বিমানটির যাত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এটা আজ রাতেই উড়ে যাবে। এন্তার গুজব-গুঞ্জন সেই

বিকেল থেকেই রাওয়ালপিন্ডির বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১১৮)

পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্টের গাড়ির বহর সরাসরি একবার বিমানবন্দরের টারমাকে গিয়ে থামল। সাথে সাথে সৈন্যরা আশেপাশের নিরাপত্তা ব্যূহ রচনা করে ফেলে। নির্বাক নিস্তব্ধ অথচ ব্যস্ত এয়ারপোর্ট। ভুট্টোর চেহারা পাংশুবর্ণ। মুখে কোনো কথা নেই। মুজিবের মনে অজানা আশঙ্কা।

কয়েক গজ দূরেই পিআইএ'র বিমানটি আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত। পাইলট স্টুয়ার্ড সবাই রেডি।

প্রবেশপথে স্বাগত ভঙ্গিতে এয়ারহোস্টেস দাঁড়িয়ে।

মুজিব বিমানের গ্যাংওয়ে থেকে টারমাকে দাঁড়ানো ভুট্টোর দিকে তাকালেন। নীরব বিনয়সূচক হাত নাড়লেন। ভুট্টোও হাত তুলে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায় মুহূর্তে সৌজন্যমূলক বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ভুট্টোর স্বাগত উচ্চারণ : পাখি উড়ে গেল।

সময় সকাল ৬টা ৩৬ মিনিট। ৯ই জানুয়ারি শেখ মুজিবের বহনকারী পাকিস্তানের বিমানটি কুয়াশাসিক্ত শীতার্ত ভোরে হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করল। পুলিশ প্রহরায় একটা রোলসরয়েস গাড়ি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গেল ক্ল্যারিজ হোটেলে। লবিতে মিনিট তিনেক বসবার পরেই তাঁকে নির্ধারিত স্যুটে নিয়ে যাওয়া হলো। নরম সাদা কার্পেট শোভিত রুম। স্বাচ্ছন্দ্যময় ডবল বেড। রূপালি বাটিতে সুন্দর ফুল সাজানো। মার্জিত রুচি, আভিজাত্য ও বিলাসের ছাপ রুমজুড়ে। সাদা সোনালি রঙের দরজার সামনে দু'জন স্মার্ট লোক দাঁড়িয়ে। এরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১২২-১২৩)

পাকিস্তানের কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রিটেন আগমনের সংবাদ খুব দ্রুত লন্ডন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সাতসকাল থেকেই দলে দলে প্রবাসী বাঙালিরা এসে ক্ল্যারিজ হোটেলে ভিড় জমাতে লাগল। প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখবার জন্য সবার চোখ উৎসুক, সব মন উন্মুখ। স্যুটের বারান্দায় ভক্ত, সমর্থক, স্বজনরা গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে। প্রবাসীদের মুখেই মুজিব প্রথম শুনতে পেলেন, স্বদেশে পাকিস্তান বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যার আসল চিত্রকথা। খুন, ধর্ষণ, আগুনের বিভীষিকাময় ছবি। রক্তে রক্তে নদী বয়ে যাওয়ার রক্তহিম করা কত কাহিনী। পাশবিক উল্লাসে পাকিস্তান বাহিনী এত নোংরাভাবে প্রলয়নৃত্যে মেতে উঠতে পারে মুজিব একটু আগেও ঠিক এতটুকু ভাবতে পারেননি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। আবেগে জড়ানো কাঁপা গলায় বারবার কেবল একটা কথাই বেরিয়ে আসছে। আহঃ আমার দুঃখিনী বাংলা মা।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১২৪)

শেখ মুজিব বললেন, 'উড এ ম্যান হু ইজ রেডি টু ডাই, নোবডি ক্যান কিল' (যে মানুষ নিজেই মরণে প্রস্তুত তাকে কেউ মারতে পারে না।) যুদ্ধের খবর আমি জানতাম। আকাশে জঙ্গি বিমানের ছুটোছুটি দেখেছি। দেখেছি হঠাৎ নিস্প্রদীপ হয়ে যাওয়া মিয়ানওয়ালী কারাগারকে। ভুট্টোর সাথে প্রথম সাক্ষাতের আগে আমি জানতাম না বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্বের খবর। পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা প্রসঙ্গে মুজিব ক্রুদ্ধ মেজাজে বললেন, স্বয়ং হিটলারও যদি আজ জীবিত থাকত তাহলে এ বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে অবশ্যই লজ্জাবোধ করত।

মুজিব বললেন, ভুটো সাহেব চেয়েছিলেন, আমাকে দিয়ে যে কোনোভাবে পাকিস্তানের সাথে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে রাখতে। আমি তাঁকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আমার জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমি কিছুই বলতে পারব না।

লন্ডনের সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবের পাকিস্তানবিরোধী কঠোর বক্তব্য জেড এ ভুট্টোর পুনর্মিলন স্বপ্নের নড়বড়ে সৌধটাকে একেবারে ভেঙে দিল।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ তথা জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বললেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন এক অপ্রতিরোধী বাস্তবতা। সেদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের সুরম্য ভবনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ বৈঠকে মিলিত হন।

হীথ বললেন: আপনাকে যে জীবিত দেখতে পাব এটা সত্যি ভাবিনি। তবু আপনার ভালোর জন্য প্রার্থনা করেছি। আপনার মুক্তির জন্য আমার সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা তদবিরও কম হয়নি।

(পা.কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১২৮)

১০ই জানুয়ারি বাহাত্তর! মহোৎসবের এমন মহেন্দ্রক্ষণ বুঝি আর কখনো আসেনি বাঙালি জীবনে। এত হাসি-খুশির ফোয়ারায় দিলখোলা এই সন্তরণ অতীতে কখনো কেউ দেখেনি এখানে। বিজয়ের নায়ক আসছেন ফিরে, দেশনেতা দেশবাসীর মাঝে। আনন্দে উচ্ছল ঢাকা'য় বইছে জীবনের জোয়ার, ওরা আজ প্রাণভরে বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করছে। হৃদয়ের সব আবেগ-আকুতি উজাড় করে দিয়ে খুশির স্রোতে ভেসে চলেছে।

কাল সারারাত ঢাকা'য় কারও চোখে ঘুম ছিল না। দিবালোকের মতোই হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় রাস্তায় আনন্দধ্বনি তুলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁকাগুলি আকাশে ছুঁড়ে ঢাকা'র শীতল রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছে উৎসব আনন্দে।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১৩২)

তোপধ্বনিতে ঢাকা কেঁপে কেঁপে গর্জে উঠছিল মহাবীরের বীরোচিত সংবর্ধনায়। আবেগে অশ্রুসিক্ত মুজিবুর রহমান বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। প্রিয় নেতাকে দেখামাত্রই এয়ারপোর্টে সমবেত লাখো জনতা অবিস্মরণীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। স্লোগানে স্লোগানে বাঙালির বুকের পাঁজর সঞ্চিত সব আবেগ উল্লাস, ভালোবাসার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ।

বিমানের সিঁড়িতে থাকতেই ফুলে ফুলে ডুবে গেলেন তিনি। রক্তভেজা স্বজন হারানোর শোকে পাথর বাংলাদেশের চোখে আজ আনন্দাশ্রুর ধারা। মুজিবের গণ্ড বেয়ে অবিরাম নামছে অশ্রুধারা। অঝোরে কাঁদছে রিক্ত নিঃস্ব আপনজনহারা শোকাতুর কত মানুষ।

জনতার চোখে পানি, তবু মুখে হাসি অমলিন। মুজিবকে পেয়ে সব হারানোর বেদনা যেন ভুলে গেছে তারা। এতদিনের শূন্য হৃদয়ের খাঁ খাঁ প্রান্তর মুহূর্তেই যেন পূর্ণতায় ভরে উঠেছে।

(পা. কা. বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১৩৫)

কাহিনীর ইতি টানা হয়েছে এভাবে :

শীত শীত পড়ন্ত বিকেলে সূর্য অস্তাচলে। গোধূলি শেষে ঢাকার আকাশে সন্ধ্যাতারার মেলা বসতে আর দেরি নেই। নতুন চাঁদ হাসবে আলো ছড়িয়ে অমানিশার আঁধার থেকে উদয়ের আলোর পথে হতাশার তিমির থেকে আশার আলো ঝরনা ধারায় মুজিবের নেতৃত্বে নবজাতকের যাত্রা শুরু।

অবশ্য একথা না বললেই নয় যে, রবার্ট পেইন বাঙালি নন। তিনি ইংরেজ। পেশায় সাংবাদিক। তাঁর চোখ বাস্তববাদী, অভিজ্ঞতা তাই বিস্তৃত। এই আন্তর্জাতিক বিদেশি সাংবাদিক যখন অন্য এক ভাষাভাষী ও জাতির মহানায়ককে নিয়ে কোনো উপন্যাস লিখবেন সেটা নিঃসন্দেহে উপন্যাস না হয়ে বাস্তব জীবন কথাই হবে। এদিক থেকে পেইনের 'দ্য টর্চার্ড অ্যান্ড দ্য ডেমনড' কে আমরা বলতে পারি প্রামাণ্য উপন্যাস। আর ইতিহাসও সে কথাই বলে। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের কারাগারের দিনগুলো পেইনের এই গল্পকথার মতো সত্য। ফলে এ গ্রন্থ শুধু উপন্যাস নয় বঙ্গবন্ধুর নয় মাসের বন্দি জীবনের সেই ভয়াবহ অবস্থার সত্য ইতিহাস।

ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশের রাজনীতির উজ্জ্বল নাম। তবে রাজনীতির বাইরে তিনি একজন সাংবাদিক, কলাম লেখক। ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি যৌবনে যেমন লেখালেখিতে সম্পৃক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এ কারণে ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইনের সঙ্গে তাঁর মিল অনেকটা।

এবং একথাও সত্য যে, পেইনের মতোই তার ভাষা প্রাঞ্জল, স্পষ্ট এবং কখনো কখনো আবেগময়। এই অনুবাদে সে ব্যাপারটিও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে, এটাকে অনুবাদ না বলে তিনি ভাবানুবাদ বলেছেন। আমাদের সৌভাগ্য হতো যদি পেইনের মূল গ্রন্থটি পড়া থাকত।

গ্রন্থ সমালোচক শাফিকুর রাহী, কবি ও প্রাবন্ধিক

বইয়ের বন্ধু

বঙ্গবন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) জীবন, কর্ম, চিন্তা, দর্শন ও আদর্শ বাঙালির প্রেরণার উৎস। এই কর্মবীর ও ত্যাগী রাষ্ট্রনায়কের জীবনে, মননে, সৃজনে, চেতনে বইয়ের বিরাট অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), তাঁর চিঠিপত্র, ডায়েরি, বক্তৃতা, ভাষণ, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও দলীয় পাঠাগার, লেখক-গবেষক-অধ্যাপক, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং নিকট আত্মীয়দের সূত্রে তাঁর বইপড়া, বইপ্রীতি, বই সংক্রান্ত অবহিতি, পাঠস্পৃহা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। ছাত্রজীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্রনায়ক জীবনে তিনি অসংখ্য বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়েছেন, ব্যক্তিগত-পারিবারিক ও দলীয় পর্যায়ে স্থাপন করেছেন পাঠাগারও।

বঙ্গবন্ধুর সেই বইপড়া ও বইপ্রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এর ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই মহান নেতার আদর্শ অনুসরণ করে বইপড়া তথা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে

নিজেকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কল্যাণব্রতে সচেষ্ট হবেন।

'বঙ্গবন্ধুর বই পড়া' শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ডাকনাম) জন্য তিনি বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। একজন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য মৌলভী সাহেব, দ্বিতীয়জন সাধারণ শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ, আর তৃতীয়জন কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলভী সাহেবের কাছে 'আমপারা' আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ও ইতিহাস।[১] এভাবে পারিবারিক পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে স্কুল ও কলেজজীবনে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যবই বঙ্গবন্ধুর পড়ার তালিকায় যোগ হয়। পড়ার সুযোগ নিয়ে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পিতা-মাতার স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে তিনজন গৃহশিক্ষক ও স্কুল শিক্ষকদের শিক্ষার পাঠদানের বাইরে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড় ধরনের পাঠের সুবর্ণ সুযোগ ছিল বাড়িতে নিয়মিতভাবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়া। এ সম্পর্কে জানা যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম'।[২]

সেই ১৯৩০ দশকে সুদূর মফস্বল বাংলার গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়ায় আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন সংবাদপত্র পাঠ করে কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান দেশ-বিদেশের খবর ও জ্ঞানার্জন করতেন। পরবর্তীকালেও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, আদর্শ ও মানস গঠনে সংবাদপত্র পাঠ অব্যাহত ছিল এবং তিনি নিজে সংবাদপত্রে কাজও করেছেন বিভিন্ন ভূমিকায়। এভাবেই তিনি হন বইবন্ধু এবং পাঠকবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর পাঠস্পৃহা ছিল অপরিমেয়। শিক্ষাজীবনের বাইরে ছাত্র রাজনীতি ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবন, কারাবন্দী জীবন, হুলিয়া জীবন, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা জীবন, অন্যান্য সময় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শহীদ হওয়ার আগে পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন বইবান্ধব ও বইপ্রেমী। তিনি দেশি-বিদেশি লেখকদের বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন। তিনি পড়তেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সংক্রান্ত বইপুস্তক। তাঁর গ্রন্থপাঠ নিবিষ্টতা ও স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণ-আলোচনা-বিবৃতি-সাক্ষাৎকারে, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা-গান-সংলাপ ও উদ্ধৃতি দেয়ার মধ্যে। রবীন্দ্র-নজরুল-ডি এল রায়ের কবিতা-গল্প, সিরাজদ্দৌলা নাটকের সংলাপ, শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর-সূর্য সেনের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ তিনি কম্পিউটারের মতো মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর পাঠ ও অধ্যয়ন পরিধি ছিল বিচিত্র ও বিস্ময়কর। জেলজীবন ও পলাতক সময়েও বই এবং পত্রপত্রিকা ছিল তাঁর সঙ্গী।

২

১৯৪০ দশকের শুরুতে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পিতা শেখ লুৎফর রহমানের উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। ওই সময় বঙ্গবন্ধুর পিতা লেখাপড়ার বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধুর পিতা তখন তাঁকে বলেছিলেন–

'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছো, এতো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না'।[৩]

বঙ্গবন্ধু পিতার সে উপদেশ কখনও ভুলেননি। কলকাতায় অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিমের স্নেহধন্য হন। আবুল হাশিম ছিলেন রাজনীতিতে প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী। আবুল হাশিম তাঁকে লাইব্রেরি গড়া এবং লেখাপড়া সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

'হাশিম সাহেব আমাদের বললেন, একটা লাইব্রেরি করতে হবে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে'।[৪] ব্যস্ততম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু বই পড়তেন। তিনি লিখেছেন-'আমরা প্রায়ই লীগ অফিসে কাটাতাম। রাতে একটু লেখাপড়া করতাম'।[৫]

উপরোক্ত লেখা থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু বই পড়ার প্রতি কতটা সিরিয়াস ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এসব প্রচণ্ড চাপের মুখেও বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। যেসব বইপত্র তিনি বন্ধু-বান্ধবদের পড়ার জন্য ধার দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ফেরত চেয়ে নেন। তিনি হোস্টেল ছেড়ে সমস্ত বইপত্র নিয়ে চলে যান তাঁর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শেখ শাহাদাত হোসেনের কাছে হাওড়ার উল্টোডাঙা এলাকায় এবং পরে কলকাতা এলাকায় বসবাসরত ছোটবোন ও তাঁর স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। ওখানে ভালো মতো লেখাপড়া করে তিনি বি.এ পাস করেন।[৬]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী। ওই সময় অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুও ঢাকায় চলে আসেন। এখানে এসেও তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আইন পড়ার জন্য। এ সম্পর্কে লিখেছেন তিনি–

'আমি ঢাকায় চলে এলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বইপুস্তক কিছু কিনলাম'।[৭]

৩

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাসের পর কয়েকটি বই বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে আলোড়িত করেছিল সে ব্যাপারে জানা যায়, তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন যে, সবারই আশা ছিল পাকিস্তান দুটো হবে–একটি হবে পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান।[৮]

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমার কাছে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ থাকত। আর হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেবের 'পাকিস্তান' বইটা এবং মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেবও 'পাকিস্তান' নামে একটা বিস্তৃত বই লিখেছিলেন সেটা; এই দুইটা বই আমার প্রায় মুখস্থের মতো ছিল। আজাদের কাটিং আমার ব্যাগে থাকত। সিপাহী বিদ্রোহ এবং ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাসও আমার জানা ছিল। কেমন করে ব্রিটিশরাজ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল, মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি, সিপাহীর চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হল–মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা কেন? মুসলমানরা কিছুদিন পূর্বেও দেশ শাসন করেছে তাই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারে নাই। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ওহাবি আন্দোলন কি করে শুরু করেছিল হাজার হাজার বাঙালি মুজাহিদরা?[৯]

১৯৪৭ সালে কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' নামের গ্রন্থে। এই গ্রন্থে কলকাতাকে বাদ দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক একতরফাভাবে ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঘোষণারও প্রসঙ্গ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থটি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন–'নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে।... এই বইতে আরও আছে, একজন ইংরেজ গভর্ণর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না, ফলে ঢাকায় খুব গরম আবহাওয়া তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল–'পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোনো কষ্ট হবে না'। অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাবো। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল।[১০]

৪

রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীন পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুকে প্রায় ১৬ বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। এই জেলজীবনে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিল বই। অন্যদিকে 'হুলিয়া'র কারণে গোপন জীবনেও ছিল বই। এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও বিভিন্ন চিঠিপত্র হতে।

রাজনৈতিক কারণে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এমন অবস্থায়ও তিনি বই পড়তেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'এভাবে পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা হল না, আর ভালও লাগছিল না। আমি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালাল উদ্দীনকে বললাম, তোমাদের কাছেই

থাকব। তারা তখন আলী আমজাদ খান সাহেবের পুরানা বাড়ি খাজে দেওয়ানে নিচের তলায় থাকত। আমি চলে আসলাম ওদের কাছে। দিনভর বই পড়তাম, রাতে ঘুরে বেড়াতাম। ঠিক হলো, আরমানিটোলা ময়দানে একটা সভা ডাকা হবে। আমি সেখানে বক্তৃতা করব এবং গ্রেফতার হব।'[১১]

বঙ্গবন্ধুর এই বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি যেমন বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তেমন ছিলেন সাহসিকতা এবং মনোবলেও দৃঢ়।

জেলজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বইপড়া, সন্তান ও স্ত্রীকে বইপড়া সম্পর্কে উপদেশ প্রদান এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নির্দিষ্ট বিষয়ে বই পাঠানোর অনুরোধ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী ও চিঠিপত্রে।

পাকিস্তান-উত্তর পরিবেশে শামসুল হক ও অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ঢাকা জেলে বন্দি ছিলেন। ওইসময় শামসুল হকের নববিবাহিত স্ত্রী আফিয়া খাতুন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি বেগম হককে ভাবী বলতাম, ভাবী আমাকেও দু'-একখানা বই পাঠাতেন। হক সাহেবকে বলে দিতেন, আমার কিছু দরকার হলে যেন খবর দেই। আমি ফুলের বাগান করতাম। তাদের দেখা হবার দিনে ফুল তুলে হয় ফুলের মালা, না হয় তোড়া বানিয়ে দিতাম।[১২]

বই এবং ফুল বঙ্গবন্ধুর কত প্রিয় ছিল এ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

১৯৫০ সালের শেষদিকে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ওই সময়ও তাঁর সঙ্গী ছিল বই, পত্রিকা এবং ফুলের বাগান চর্চা। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি এই প্রথম ফরিদপুর জেলে আসলাম।... বই আমার কাছে যা আছে তাই সম্বল। খবরের কাগজ দিতে বললাম। হাসপাতালের সামনে জায়গা ছিল, একটা ফুলের বাগানও ছিল, তাকে যাতে আরও ভাল করা যায় তার ভার নিলাম'।[১৩]

ফরিদপুর জেলে বন্দি থাকার সময় বঙ্গবন্ধু পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন এর বাংলা তরজমাও পড়তেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি'।[১৪]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত ইসলাম ধর্মনিষ্ঠা এবং মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম অনুধাবনের জন্য আরবি ভাষার পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায়ও এর তরজমা পাঠ করার বিষয়টি।

৫

বই এবং পাঠাভ্যাসের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রবল আকর্ষণ সম্পর্কে জানা যায় জেলখানা থেকে লেখা চিঠি হতেও। ১৯৫১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-র কাছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> 'মানিক ভাই ১২-০৯-৫১
> আমার সালাম নেবেন। আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। চিকিৎসার চেষ্টা খুবই হইতেছে.... । আমার জন্যে কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোনো কিছুরই দরকার নাই। নতুন চীনের কিছু বই পত্রিকা যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন।.... ।
>
> আপনার ছোট ভাই
> মুজিব'।[১৫]

এই চিঠিতে বর্ণিত বই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন–

'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার একটা বড়ো ধরনের পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে এই চিঠিতে। আর তা হলো, 'নতুন চীনের কিছু বই পত্রিকা যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন...'। এই চিঠি লেখার মাত্র দু'বছর আগে ১৯৪৯ সালে কমরেড মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তরুণ-যুব রাজনীতিক মুজিবকেও দেখছি তা আকর্ষণ করেছিল। এ ইতিহাসটি এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসে অনাবিতই রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটেই হয়তো ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রথম সফর তালিকায় চীনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন'।[১৬]

বঙ্গবন্ধুর বই পাঠের পরিধি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন ছিল খুবই ব্যাপক। বাংলাদেশের বহু কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যেমনি ছিল তাঁর সান্নিধ্য ও পরিচয় তেমনি তাঁদের লেখালেখি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অবহিত। একবার লেখক শওকত ওসমান সম্পর্কে কেউ কেউ অনুযোগ তুললে বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে শওকত ওসমানের লেখালেখি সম্পর্কে অবহিত হতে পরামর্শ দিয়ে নিজের বিছানার তলা থেকে তাঁর লেখা বই 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' বের করে দিয়ে বলেছিলেন, এটা তারা পড়েছেন কিনা। এই তথ্য জানা যায় শওকত ওসমানের নিজের বর্ণনায়।[১৭]

অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহীমের লেখা থেকেও জানতে পারি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক তাঁর (নীলিমা ইব্রাহীম) লেখা বই পড়ার কথাও। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নীলিমা ইব্রাহীম দেখা করতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনার অনেক বই আমি জেলে বসে পড়েছি'।[১৮]

মুক্তিযোদ্ধা-লেখক-গবেষক আবীর আহাদকে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু এডগার স্নো রচিত বহুল পঠিত গ্রন্থ 'রেড চায়না'র একটি কপি দিয়ে তাঁকে বইটি ভালোভাবে পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন বলে এক সাক্ষাৎকারে আবীর আহাদ জানিয়েছেন।[১৯]

৭

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির নেতা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী নৃশংসতা চালায় নিরীহ বাঙালির ওপর। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পর বাংলাদেশ শত্রু ও দখলদার মুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের কারাগার থেকে। ক্ষত-বিক্ষত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পুনর্গঠনের দায়িত্ব পড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ওপর। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে সকল প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। এর ছাপ পড়ে লেখক সমাজ ও বইয়ের ওপর। পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বাংলাদেশের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে অসংখ্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই। বাংলা একাডেমি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় অনেক বই।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই প্রকাশ, প্রচার, বিপণন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এগিয়ে আসে নতুন উদ্যম নিয়ে। আয়োজন করে ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মেলা (১৯৭২), জাতীয় গ্রন্থ মেলা (১৯৭৪) এবং চট্টগ্রামে জাতীয় গ্রন্থ মেলার (১৯৭৫)। গ্রন্থকেন্দ্রের মাসিক পত্রিকা 'বই' নতুন আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে 'বই'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে (৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)। এই সংখ্যায় সর্বমোট লেখার সংখ্যা ছিল ৪২টি। এরমধ্যে কবিতা ছিল ৩৬টি। অন্নদা শঙ্কর রায়ের 'বঙ্গবন্ধুকে' নিয়ে লেখা সেই বিখ্যাত কবিতাটিও 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা, গৌরী মেঘনা বহমান'ও ছিল এই সংখ্যায়।

আরো ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ লেখক, অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের প্রতি সচিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। এসবই ছিল বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবনার ফসল।

১৯৭২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী গ্রন্থ প্রদর্শনী। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উপলক্ষে এক বাণী দেন। তিনি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উৎসব ও গ্রন্থ প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাণীতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ পালন উপলক্ষে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শান্তিকামী ও জ্ঞানপিপাসু মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারবে।[২০]

বঙ্গবন্ধুর সংগৃহীত বই, বই পাঠের তৃষ্ণা এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরির কথা দেশ-বিদেশের লেখক-সাংবাদিক-গবেষক-রাজনৈতিক সহকর্মী-পারিবারিক সদস্যদের বর্ণনায় কিংবদন্তিসম উল্লেখ পাওয়া যায়। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে ব্যক্তিগত পাঠাগারে আলমারি ভর্তি বইয়ের পাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা অবস্থায় বইপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর একটি আলোকচিত্র ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। ধানমণ্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি ও সংগৃহীত বই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবেগময় বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন–

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হলো। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছাল তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজ মনে পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাঙচুর করে, বাথরুমের বেসিন, কমোড, আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়। দীর্ঘ নয়মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আরেক গ্রুপ আসত। সোনাদানা, জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা সব এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এবং মা'র যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায়, কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

ছয়দফা দেবার পর অনেক সোনা-রূপার নৌকা, ৬-দফার প্রতীক প্রায় ২-৩শ' ভরি সোনা ছিল। এগুলি আমার ঘরের স্টিলের আলমিরায় রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্যে আফসোস নেই, আফসোস হলো বই। আব্বার বহু পুরোনো কিছু বইপত্র বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলি সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ সাল থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন, কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সবসময় আব্বার সঙ্গে যেত।

জেলখানায় বই বেশির ভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন; কিন্তু আমার মা'র অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ, রাসেল, শেলী ও কীটসসহ বেশ কয়েকখানা বই। এর মধ্যে কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয় তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল।

মা, এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও আব্বাকে অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মা'র সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সবসময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলি ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলির জন্যে। ঐতিহাসিক দলিল হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি; কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্যেও বাড়ির দরজা খুলে দেয়নি জিয়া। রাস্তার ওপর বসেই আমরা মিলাদ পড়ি।

জেনারেল জিয়া সরকারের পক্ষ থেকেই আমাকে থাকার জন্যে বাড়ি দেবার প্রস্তাব পাঠানো হয়। আমি একজন স্বৈরাচারের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি কিছু সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। (যেমন, জেনারেল এরশাদ সরকারের কাছ থেকে জিয়ার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন) আমরা কোনোদিনই কোনোকিছু গ্রহণ করিনি।

জেনারেল জিয়া নিহত হবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল' জারি হয়, এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনো, কেবলমাত্র বসার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি, মিটিং করেছি। অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে বহু মিটিং হয়েছে এখানে। ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে।

আবার ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর আমাকে গ্রেফতার করে এই বাড়িতে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের সকল কাজ এই বাড়িতে বসে করি।

এই বাড়িটি যখন ১২ জুন, ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হলো, তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকা-মাকড়ে ভরা। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি-কাচ ভাঙা, বইগুলি বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভিতরে এখনো বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম ছিল 'শ্রদ্ধাঞ্জলী,' বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভিতরে একখানা আলগা ছবি একজন মুক্তিযোদ্ধার, বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষত-বিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ঠিক ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয় তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। এ বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়'।[২১]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায়ও রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির প্রসঙ্গ। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার জর্জ বার্নাড শ, বাট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি, বুকসেলফে বাঁধাই মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরিত ছবির উল্লেখ।[২২]

শুধু ব্যক্তিগত লাইব্রেরি নয়, বঙ্গবন্ধুর পাঠস্পৃহা এবং বইপ্রীতির নিদর্শন ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস পর্যন্ত। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছিল কয়েক হাজার বইসমৃদ্ধ পাঠাগার। এই পাঠাগারে দেশীয় গ্রন্থ ছাড়াও ছিল জার্মানি, বুলগেরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ হতে প্রাপ্ত বই। এই পাঠাগার খোলা থাকত প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।[২৩]

দলীয় কার্যালয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল দলীয় কর্মীদের পাঠ-মনস্কের মাধ্যমে রাজনীতি-ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা।

বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর বইপড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে আরো গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধু যেমনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন তেমনি তিনি নিজেও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নামের বই লিখে বাঙালি তথা বিশ্ব-পাঠকের কাছে রেখে গেছেন একজন প্রথম শ্রেণির লেখকের নিদর্শন। বই পড়ে যেমন বঙ্গবন্ধু নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, অপরকে বই পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন তেমনি নিজেও বই লিখে মনন ও সৃজন রাজ্যে রেখে গেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক দীপ্ত আলোর শিখা।

সহায়ক তথ্যসূত্র

১. বেবী মওদুদ, শেখ মুজিবের ছেলেবেলা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১, ১৩ ও ২৭।
২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৫. উদ্ধৃত, ড. মোহাম্মদ হান্নান, মানিক মিয়াকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চারটি ঐতিহাসিক চিঠি, শাহ আলমগীর সম্পাদিত 'নিরীক্ষা', পিআইবি, জুলাই-আগস্ট, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ৪১-৪২।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
১৭. শওকত ওসমান, কাছে থেকে দূরে, দূর থেকে কাছে শেখ মুজিব, নূহ উল আলম লেনিন সম্পাদিত 'ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৩০।
১৮. নীলিমা ইব্রাহীম, কৃষ্ণান্ধকার, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭১।
১৯. আবীর আহাদের সাক্ষাৎকার, বিজয়নগর, ঢাকা তাং-২৮.০১.২০১৬।
২০. মোশাররফ হোসেন, আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে বাণী ১৯৭২, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু কোষ', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১।
২১. শেখ হাসিনা, স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৭-৯৮।
২২. উদ্ধৃত, শহীদুল হক খান, বঙ্গবন্ধু সকলের, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫০।
২৩. প্রাগুক্ত।

লেখক: গবেষক ও চলচ্চিত্র সমালোচক

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা

রীতা ভৌমিক

একাত্তরের পহেলা মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ও আপসহীন নেতৃত্ব পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বাংলাদেশের মানুষ।

পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান শাহেবজাদা ইয়াকুব খান ৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করেন তিনি যেন ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা না দেন। তাহলে রেসকোর্স ময়দানে কামান এবং বিমান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না।'

৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে উন্মত্ত জনতার ঢল নামে। সারা দেশ থেকে দলে দলে জনগণ রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হন। জনসভায় সেদিন কচিকাঁচারাও প্লাকার্ড হাতে অংশ নিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল– 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো বাংলাদেশ মুক্ত করো।' বাংলার সাড়ে সাত কোটি

মানুষ আশা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। শেখ মুজিব সেদিন বেলা ৩টা ২০ মিনিটে সভাস্থলে উপস্থিত হন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা সরাসরি না দিলেও তার ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে হুঁশিয়ারি প্রদান করেছিলেন, 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...। তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থেকো।'

গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এভাবে প্রকাশ পায়– 'রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান' শিরোনামে 'জয়বাংলা' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, '... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দফতর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছে দেবেন। আর সাতদিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে–প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো–কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালি, অ-বাঙালি–তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলো এবং আমাদের যা-কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' একাত্তরে রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সব পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

একাত্তরের ৮ মার্চ দৈনিক আজাদ-এ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' শিরোনামে জানা যায়, 'বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল ৭ই মার্চ জাতির উদ্দেশে শত্রুর হামলা মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।'

দৈনিক ইত্তেফাকে 'পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি'- শিরোনামে প্রকাশ-(ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়, (খ) সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়া হয়, (গ) নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা হয় এবং (ঘ) নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়

বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) বিকালে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুক্তি-সেনানীর বজ্রনির্ঘোষ সংগ্রামী ধ্বনির তুর্যনাদের মধ্যে জলদগম্ভীর স্বরে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন- 'আপনি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ডাকিয়াছেন। আগে আমার এইসব দাবী মানিতে হইবে-তারপর বিবেচনা করিব, অধিবেশনে যোগ দিব কিনা।' এই দাবী পূরণ ছাড়া পরিষদে যাওয়ার অধিকার বাংলার জনগণ আমাকে কয় নাই।...

আজ থেকে আমার নির্দেশ–

... আর স্লোগানমুখর লাঠিধারী সেই স্বাধিকারকামী জনসমুদ্রকে লক্ষ করিয়া শেখ মুজিব শপথদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, প্রস্তুত হও। এবারের সংগ্রাম বাঙ্গালীর মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত দিতে আমি প্রস্তুত।'

তিনি বলেন, ...'ঘরে ঘরে সংগ্রামের দুর্গ সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়িয়া তোল। মুক্তি আসিবেই।'

'উত্তাল-উদ্দাম জলধিতরঙ্গ'- শিরোনামে ৭ কোটি শোষিত বাঙ্গালীর বিক্ষুব্ধ আত্মার আর্তনাদকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া নিয়া শেখ সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত'- এই কথাটির দ্বারা তিনি তাঁর ২০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিংহ পুরুষ। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে এভাবেই স্বাধীনতার পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর দেশকে স্বাধীনতার পক্ষে ধাবিত করার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনায় বসে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে সুস্পষ্ট ইতিবাচক ইঙ্গিত তিনি পাননি। তাই তিনি দেশের প্রত্যেক গ্রাম, মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে উঠেছিল। সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এক্স আর্মিদের দ্বারা ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপের কর্মীরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বস্তুতপক্ষে সরাসরি একাত্তরের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও দৃপ্তকণ্ঠে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাই তিনি জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন– 'এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে...।'

তিনি তার ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ পর্যায়ে এসে বলেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, প্রস্তুত হও। এবারের সংগ্রাম বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত দিতে আমি প্রস্তুত।'

একাত্তরের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার সংবাদটি দ্য টাইমস (লন্ডন)-এ ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালের পত্রিকায় Heavy fighting as Sheikh Mujibur declares E Pakistan independent' শিরোনামে এভাবে প্রকাশ পায়–

'Civil war raged in the eastern region of Pakistan last night after a radio broadcast announced that Sheikh Mujibur Rahman had proclaimed it an independent republic. President Yahya Khan outlawed the Sheikh's Awami League and denounced the Sheikh himself as a traitor whose crime 'would not go unpunished.'

Political activity throughout Pakistan has been banned and an indefinite curfew has been imposed on the eastern wing.

Official communications between East Pakistan and the rest of the world have been cut. The only news about

the day's dramatic developments came in clandestine radio bulletins broadcast from Dacca and from reports by travellers crossing into India....'

২৬শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সময় রাত ৮টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দ্য টাইমস অনুযায়ী, আমরা দুটি সংবাদ পাচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকায় অবস্থিত গোপন বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা। ঢাকায় অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ টিক্কা খান এবং তার সহকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলছে, এবার তিনি শাস্তি এড়াতে পারবেন না।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দ্য টাইমস (লন্ডন) এ President says traitors must be punished' শিরোনামে প্রকাশ :

Delhi, March 26-Sheikh Mujibur Rahman tonight proclaimed East Pakistan the sovereign independent people's Republic of Bangladesh. According to a clandestine radio report monitored near the East Pakistan Border.

The Press Trust of India (P.T.I) published the report which was monitored at Agartala, in the Indian territory of Tripura, about 56 miles east of Dacca, PTI. said that the broadcast was not made by the Sheikh himself but by an unidentified announcer.

The broadcast said that troops of the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles, and the 'ntire Police force' had surrounded West Pakistan troops in Chittagong, Comilla, Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna, and that heavy fighting was continuing.

A later message said that forces loyal to Sheikh Mujibur had captured the Chittagong station of Radio Pakistan forcing troops to retreat after fierce fighting...

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ শুরু হয়ে গেছে। দ্য টাইমসের পরের এই রিপোর্টে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণায় বলেছিলেন, আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা। এরপর স্বাধীনতার ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার হয়েছে ২৬শে মার্চ রাতে। তবে সেখানে ঘোষকের নাম প্রচার করা হয়নি। এই অর্থে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক।

স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানায় ইপিআর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ড় যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোষ নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ডেভিড লসাক একাত্তরের ৭ই মার্চ ঢাকায় অবস্থান করলেও ২৫শে মার্চ ভারতের দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' বইটি প্রকাশ হয়। এ বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন- They were sustained, for a time, by the broadcasts of the clandestine Radio Bangladesh soon after darkness fell on March 25, the votee of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. He called on Bangalis to go underground, to reorganize and to attack the 'Invaders'. And he claimed to be as free as Bangladesh — a tragically true claim for he was in prison. But it was a claim which fired the resolve of the Mukti Fouj in those early, fraught weeks before they succumbed to the legions of the west. Radio Bangladesh continued to broadcast but its claim grew wilder...'

দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ডেভিড লসাক গোপনসূত্রে জানতে পেরেছিলেন, ২৬শে মার্চ রাতে গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বকণ্ঠে ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। তিনি তার সংবাদে তথ্য উল্লেখ করেননি। ডেভিড লসাকের সংবাদের সূত্র জানা গেছে। ডিফেন্ড ইন্টারলিজেন্স এজেন্সি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা এটি মনিটর করেছিল। সেখান থেকে তিনি এ তথ্য পেয়েছিলেন। ২০০৩ সালে এ তথ্য অবমুক্ত করা হয়। প্রেস টেলিগ্রাম একাত্তরের ২৬শে মার্চ পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রকাশ করে।

দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। কিন্তু দ্য টাইমস, আনন্দবাজার পত্রিকায়ও দুপুরের অনুষ্ঠান প্রচারের কোনো তথ্য নেই। ছয় মহাদেশের ২৭ মার্চের কোনো পত্রিকায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের ২৬শে মার্চ দুপুরের অনুষ্ঠানের কোনো সংবাদ প্রকাশ হয়নি। এতে ২৬শে মার্চের দুপুরের অনুষ্ঠানের প্রচারণার সত্যতা পাওয়া যায়নি। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে বলা হয়েছে, ২৬শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শেষে বলা হয়েছে, ঘোষণাপত্র বা Proclamation of Independence ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে গণ্য করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাত ১ টার দিকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে লে. জে. টিক্কা খানের তত্ত্বাবধানে বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে ২৭ মার্চ পর্যন্ত আটক রাখেন। ২৮ মার্চ তাঁকে পিআইএ বিমানে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

একাত্তরের ২৭ মার্চ একই পত্রিকার আরেকটি রিপোর্টে জানা যায়। 'Sheikh Mujibur Rahman now faces the crisis he has always feared/ The making of a martyr' শিরোনামে প্রকাশ:

What I want is emancipation for my people', the Sheikh said maintaining the policy. He has hitherto taken, even in public rallies, of avoiding the mention of independence, 'Let us face it - even when the British ruled India they did not tax us. They reaped the fruits of the land but they did not impose taxes on us. At the moment we are being treated by the West Pakistanis as a mere colony and a market place. We have our rights and these were underlined in the results of the elections. Only a few days after her election Mrs. Gandhi was sworn in as Prime Minister. My election was last year but I am still waiting to be sworn in....'

তথ্যসূত্র

১. 'জয়বাংলা' বিশেষ সংখ্যা
২. দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১
৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ১৯৭১
৪. খন্দকার কামরুল হুদা, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও শেখ মুজিব, মার্চ ১৯৯৫, পৃ. ২১৬, ২৩৮
৫. তপন কুমার দে, সম্পাদনা, স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, তাম্রলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৮, ২৩৬
৬. Press Telegram, published california, 26 Mrach, 1971
৭. The Times (London) 27 March, 1971

লেখক: সাংবদিক, যুগান্তর

একজন স্বপ্নস্রষ্টা
মানুষের সৃষ্টি

মুনীরুজ্জামান

বাঙালি কি কোনো দিন ভেবেছিল, একদিন তাদের অর্থাৎ বাঙালির নিজস্ব স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে? বাঙালি কি কখনও স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল? ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগে পূর্ব বাংলার বাঙালি তো পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটি নিয়েই স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছিল। আমরা সকলেই জানি, পূর্ব বাংলার বাঙালির সেই স্বপ্ন ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির 'পাকিস্তান-স্বপ্ন' ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। বলা যায়, এ সময়ের পরে জাতি হিসেবে বাঙালির আর কোনো স্বপ্ন ছিল না। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক এবং কৃত্রিম কাঠামোর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল বাঙালির স্বপ্ন। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সর্বোপরি সামরিক রাজনীতি বা রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব বাঙালির 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' স্বপ্ন ক্রমাগত ধূলিসাৎ হতে লাগল। ইংরেজ আমলের পরাধীনতার পর পাকিস্তানের মধ্যেই পরাধীন হয়ে গেল বাঙালি। স্বাধীনতার স্বপ্ন শেষ হয়ে

গিয়েছিল ১৯৪৮ সালে, ভাষার ওপর যখন আঘাত হানল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বলা যায়, এর পরের ২৪ বছর পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যে টিকে থাকার জন্য অস্তিত্ব লড়াই চালিয়ে গেছে বাঙালি। স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন মৌন হয়ে গিয়েছিল। বলা যায় স্বপ্ন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে ভুলতে বসেছিল বাঙালি।

একজন। এক ব্যক্তি। একজন বাঙালি কখনই বিচ্যুত হননি স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকে। তিনি অবিরাম স্বপ্ন দেখেছেন আর স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাঙালিকে। স্বাধীনতার স্বপ্ন। জনকের স্বপ্ন সন্তানকে ঘিরে। তেমনি তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালিকে ঘিরে, বাংলাদেশের মানুষকে ঘিরে। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন হবে, নিজেদের ভাগ্য নিজেরা ফেরাবে। কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, আপন ভাগ্য গড়বে আপন হাতে। যে জাতি স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল, সেই জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, ১৯৭১ সালে সেই জাতির হাতে স্বাধীনতার চাবি তুলে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই স্বপ্নস্রষ্টা।

যে কোনো নিরপেক্ষ রাজনৈতিক গবেষক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করলে দেখতে পাবেন, একেবারে শুরু থেকেই তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য ছিল অর্জুনের তীরের মতো এককেন্দ্রিক। মহাভারতে অর্জুন যেমন লক্ষ্যভেদের জন্য ঘূর্ণায়মান চক্রের মধ্য দিয়ে শুধু মাছের চোখটি দেখতে পেয়েছিলেন, জগৎ-সংসার তখন তার চোখের সামনে থেকে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল। তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও রাজনীতির শত উত্থান-পতন এবং সর্পিল পথ সত্ত্বেও বাঙালির জন্য শুধু স্বাধীনতাকেই দেখতে পেতেন। অন্য সব কিছু তাঁর সামনে থেকে তখন অপসারিত ছিল। ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মাছটি দেখার সময় অর্জুনের চোখে অন্য কোনো বস্তু দৃশ্যমান থাকলে তিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন না। তেমনি বঙ্গবন্ধুর নিষ্ঠা যদি বাঙালির স্বাধীনতাকে ছাপিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে ব্যস্ত থাকত তবে তিনিও বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারতেন না। অর্জুনের ছিল নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অনুশীলন, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস আর নিজের ওপর আস্থা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হচ্ছে– বাঙালির ওপর শর্তহীন ভালোবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ বৈশিষ্ট্যগুলোই বঙ্গবন্ধুকে বিজয়ী করেছে।

> *একজন। এক ব্যক্তি। একজন বাঙালি কখনই বিচ্যুত হননি স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকে। তিনি অবিরাম স্বপ্ন দেখেছেন আর স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাঙালিকে। স্বাধীনতার স্বপ্ন। জনকের স্বপ্ন সন্তানকে ঘিরে। তেমনি তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালিকে ঘিরে, বাংলাদেশের মানুষকে ঘিরে।*

আমরা যদি যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা দেখি তাহলে দেখব, সুপ্ত দাবিটি ২১-দফাতেই ছিল। যেটা আরো পরিষ্কার করেছেন বঙ্গবন্ধু ৬-দফা দাবিতে। এবং ২১-দফা, ৬-দফার যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। রাজনীতির ধারাবাহিকতায় ২১-দফা, ৬-দফার শেকড় যে লাহোর প্রস্তাব, সেটাও অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিক বাস্তবতা নেই।

কী ছিল লাহোর প্রস্তাবে? লাহোর প্রস্তাবের তৃতীয়টিতে বলা হয়েছিল : 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ যে ভারতে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না যদি তা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত না হয়।' বর্ণিত মূলনীতির দ্বিতীয়টি হচ্ছে– 'প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) গঠন করতে পারে।'

কী ছিল ২১-দফায়? একুশ দফার ১৯-দফায় উল্লেখ ছিল : 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে আনয়ন, দেশরক্ষা ক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা।'

কী ছিল ৬-দফায়? ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবি উত্থাপন করেন। তখন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। আনুষ্ঠানিকভাবে ৬-দফা উত্থাপন করা হয় লাহোর প্রস্তাবের সাথে মিল রেখে ২৩ মার্চ। ৬-দফার মূল দাবিগুলো সংক্ষেপে : (১) [পাকিস্তানের] সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে ফেডারেল ও সংসদীয় পদ্ধতির। নির্বাচন হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রতিনিধি নির্বাচন হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। (২) [পাকিস্তানের] কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়। (৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় হতে পারবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে। (৪) রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগান দেওয়া হবে। ... রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকে। (৫) ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসাব রাখতে পারে সংবিধানে সেরূপ বিধান থাকতে হবে। ... বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের থাকবে। (৬) জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

লাহোর প্রস্তাব, ২১-দফা এবং ৬-দফা আমরা একসঙ্গে বিশ্লেষণ করলে পাচ্ছি– একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে দফাগুলো। সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালির স্বাধীনতা।

ভারত ভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে লাহোর প্রস্তাব এবং ২১-দফা বিশ্লেষণ করলে এর অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্ত ৬-দফা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্তটিরই বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন ৬-দফার মধ্য দিয়ে। ৬-দফা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত দাবিটি স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে অনেক বেশি এবং স্বাধীনতার চেয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কম। ছয় দফার এই রাজনৈতিক তাৎপর্যটি জেনেশুনেই দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আর এর অন্তর্নিহিত পরিণতি বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানের সামরিক-আমলা-সামন্ত ভূস্বামী-একচেটিয়া পুঁজির সরকার। সেই করণেই তারা কখনোই ৬-দফা মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধুও জানতেন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কখনোই ৬-দফা মেনে নেবে না, পরিণতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বস্তুত ৬-দফা দিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে একটি অনন্য কৌশলের নজির স্থাপন করেছেন। ৬-দফা মেনে নিলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। না মানলে, পাকিস্তানই থাকে না, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর এই অপরাজেয় রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয় পাকিস্তান। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

রাজনীতিকরা রাজনীতি করেন ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে। সরকার পরিচালনার লক্ষ্যে। ঔপনিবেশিক আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোয় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা সংগ্রামের বাস্তবতা সৃষ্টি করেননি। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর শাসন শোষণে সেসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অনিবার্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি মোটেই সেরকম ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে অনিবার্য করেছিলেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ তাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে মাত্র। এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, এর নেতৃত্ব এবং বিজয়ের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেটা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ বৈশিষ্ট্যটি তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যিনি স্বপ্ন ফলিয়েছেন। সেজন্যেই তিনি স্বপ্নস্রষ্টা।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ

আমার বাবা কর্নেল জামিল
কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতীক

আফরোজা জামিল কঙ্কা

দিনটি ছিল শুক্রবার, ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কায় কালো মেঘে ছেয়েছিল সেদিনের মধ্যরাতের আকাশ। আনুমানিক ভোর ৪টা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে গণভবনে একটি ফোন বেজে উঠল। ফোনের এ প্রান্ত থেকে জবাব ছিল–ফোর্স নিয়ে আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, স্যার। মধ্যরাতের সেই অন্ধকার ভেদ করে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে অকুতোভয় একজন সৈনিক যিনি কর্তব্যনিষ্ঠার এক বিরল নজির সৃষ্টি করেন, তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, বীরউত্তম (যিনি মূলত কর্নেল জামিল নামেই পরিচিত)। বঙ্গবন্ধুকে যদি বাঙালি জাতির সমগ্র ইতিহাস বলা হয়, তবে ব্রিগেডিয়ার জামিল হলেন সে ইতিহাসেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যিনি সে দিনের সেই বর্বর ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের অমোচনীয় কলঙ্ক মেটাতে বীরদর্পে এগিয়ে গিয়েছিলেন। জীবন দিয়ে এক অনুকরণীয় বীরত্বগাঁথার জন্ম দেন। মহাখালির নিউ ডিওএইচএস-এর গ্যালারি কসমসে বসে (ব্রিগেডিয়ার জামিলের

বড় মেয়ে তাহমিনা এনায়েতের চিত্রশালা) জামিলের মেঝ মেয়ে চিত্রশিল্পী আফরোজা জামিল কঙ্কা **নাসরিন শওকতের** সঙ্গে দেয়া একান্ত সাক্ষাতকারে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা ও পূর্বাপর সময়ের কথা বলছিলেন। কসমস গ্যালারীর দেয়ালের ছাপচিত্রের সরব উপস্থিতি আর অলো-আঁধারীর ইন্দ্রজালে প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে গিয়ে মুহূর্তগুলো ভারী হয়ে উঠছিলো বেদানাহত আবেগে। আবার কখনও বা পুরোনো স্বর্ণ-স্মৃতি রোমন্থন এক অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিলো কঙ্কার মুখ। তখন কঙ্কার বয়স ছিল ১২ বছর।

প্রশ্ন: সেই কৈশোর থেকে আজকের এই পরিণত সময়ে এসে– একজন সৈনিক কর্নেল জামিল ও একজন পিতা কর্নেল জামিল সম্পর্কে বলুন।

আফরোজা জামিল কঙ্কা: সব সন্তানের কাছেই তার বাবা খুব প্রিয় হন। আমার বাবা শহীদ কর্নেল জামিল একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাকে একজন মানবতাবাদী মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি। এটাতো সবারই জানা যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদেরকে একেবারেই জায়গা দেয়া হত না। আমরা নিজের চোখেও দেখেছি এবং বাবা-মায়ের কাছেও গল্প শুনেছি যে, সেসময় বাঙালিদের খুব হেয় করা হত। ওই প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিতে, সেখানে যত বাঙালি অফিসার ছিলেন, তাদেরকে সব সময় সাহায্য-সহযোগিতা করার একটি প্রবণতা আমার বাবার মধ্যে ছিল। কেউ কোন দুর্ঘটনায় পড়লে বা চাকরিতে কারো অসুবিধা হলে–বাবা চলে যাচ্ছেন সাহায্য করতে। ওনার এ মানবিক দিকটাতো ছিলই এর সঙ্গে আর একটি উল্লেখ করার মতো দিক ছিল। আর সেটা হলো, আমার মা আঞ্জুমান আরা জামিলের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। স্বামীরা স্ত্রীদের ভালোবাসবেন–এটাই চিরায়ত। কিন্তু এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভালোবাসার পাশাপাশি স্ত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা করা। আমরা দেখেছি, আমার মাকে উনি অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমার বাবা খুব কল্পণাবিলাসী (রোমান্টিক) ছিলেন। বাবা-মা দুজনেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন। এবং একারণেই আমার মাকে সব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি ওনার মধ্যে প্রকট ছিল। আবার একই সঙ্গে তিনি খুব স্নেহপ্রবণ বাবাও (লাভিং ফাদার) ছিলেন। বেশ কয়েকবার বাবার স্নেহপ্রবণতার প্রমাণও পেয়েছি। একবারের কথা– সময়টা তখন ১৯৬৮ সাল। আমারা সবাই তখন পাকিস্তানের কোয়েটায় ছিলাম। আমার নানা মারা যাওয়ার কারণে সেসময় মাকে একা ঢাকায় আসতে হয়েছিল। ওই একটা মাস আমি আর আমার বড় বোন বাবার কাছে ছিলাম। সেসময় দেখেছি যে, একজন বাবাও তার সন্তানদের এত সুন্দরভাবে যত্ন নিয়ে দেখে রাখতে পারেন! আমাদের দু'বোনকে স্কুলে পাঠানো থেকে আরাম্ভ করে স্কুল বাস থেকে নিয়ে আসা, বাবা নিজেই করতেন। তারপর স্কুলের দেয়া বাড়ির কাজগুলো আমাদের দু'বোনকে সঙ্গে নিয়ে নিজে হাতে করাতেন। এছাড়াও যে কোন প্রয়োজনেই আমরা বাবাকে পাশে পেয়েছি সব সময়। তাই একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই বাবাকে দেখি।

আর সৈনিক হিসেবে যখন ওনাকে দেখি..... তারতো কোনো তুলনাই হয় না। চাকরির শুরু থেকেই তিনি সিগন্যালসের কমিউনিকেশনে এবং সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর আইএসআইতে ছিলেন (এক্ষেত্রগুলোতে ওনার পোস্টিং থাকতো)। এছাড়াও বিভিন্ন মিশনের কাজেও ওনাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হতো। কাজের প্রতি ওনার নিষ্ঠা এমন ছিল যে, যখন কাজের প্রসঙ্গ আসতো তখন কাজ একদিকে আর বাকী সব কিছু আরেকদিকে। এবং আমার মনে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্তের কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে তিনি তা প্রমাণও করে গেছেন যে– কাজের প্রতি দায়িত্ব বা নিষ্ঠা কাকে বলে।

প্রশ্ন: কর্নেল জামিলের বঙ্গবন্ধুর কাছের হয়ে ওঠার গল্পটা বলুন।

আফরোজা জামিল কঙ্কা: আমি অবশ্যই গর্ববোধ করি যে, আমার বাবা– কর্ণেল জামিল বঙ্গবন্ধুর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে প্রেম এবং ভালোবাসা বাবার ছিল তা অনবদ্য। মনে হয়, এ কারণটাই আরও বেশি ওনাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ১৫ই আগস্টের ঘটনাস্থলে। ৭৫-এর পর থেকেই আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা গল্পগুলো এবং তিনি যা লিখেছেনও– সেগুলো আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেছে।

১৯৬৬ সাল। বাবা তখন খুলনা আইএসআইয়ের দায়িত্ব পালন শেষ করে ঢাকা আইএসআই-এ যোগ দেন। এসময় তার সঙ্গে আরও তিন বাঙালি অফিসার আইএসআইতে কর্মরত ছিলেন। তাদের মধ্যে মেজর রউফ (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং ডিজিডিএফআই-এ ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত ছিলেন), ক্যাপ্টেন মোহাব্বত জান চৌধুরী (যিনি পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) এবং মেজর মুস্তাফিজ (পরবর্তীতে মন্ত্রী হন) ছিলেন। ওই সময় মেজর রউফ ও আমার বাবা (কর্নেল জামিল) বঙ্গবন্ধুর কাছে তথ্য আদান-প্রদান করতেন। এবং অনেক বিষয়েই তাঁকে সহযোগিতা করতেন। এ সময়েই কর্নেল জামিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা সংক্রান্ত সব নথিপত্র রাতের অন্ধকারে রমনা পার্কে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। এ প্রমাণাদি ধ্বংস করার কারণেই পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা বিষয়ে আর এগুতে পারে নি। ফলে যেসব বাঙালি জুনিয়র অফিসাররা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছিলেন, তারা (তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ও কর্নেল হুদা) কোর্ট মার্শাল থেকে বেঁচে যান। এই পুরো ঘটনাটি পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন। আর এ ঘটনার পর থেকেই সম্ভবত বাবা বঙ্গবন্ধুর আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছের হয়ে ওঠেন।

এদিকে কর্নেল জামিলের এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আইএসআই হেড কোয়ার্টার অবগত হয়। পরবর্তীতে কর্নেল জামিল যখন (১৯৬৮ সাল) কোয়েটায় স্টাফ কোর্স করছিলেন, তখন তাকে লাহোর আইএসআই হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এতে তার কোর্ট মার্শালের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়। তবে আইএসআই বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। আর এভাবেই কর্নেল জামিল কোর্ট মার্শাল থেকে বেঁচে যান।

পরবর্তীতে বাবা সামরিক সচিব থেকে ডিজিডিএফআইয়ের ডিজি হয়েছিলেন। কিন্তু চার্জ বুঝে পাননি। সেসময় ব্রিগেডিয়ার রউফ লকারের সব চাবি নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য লন্ডন চলে যান। পরে এক সপ্তাহের জায়গায় তিনি সেখানে তিন সপ্তাহ কাটান। বাবা একদিন অফিস থেকে এসে দুপুরে খাবার খেতে খেতে মাকে বলছিলেন যে, 'আমি বুঝতে পারছি না , রউফ ভাই লকারের সব চাবি নিয়ে চলে গেলেন কেন? চার্জও বুঝিয়ে গেলেন না! আমি কোন কাজই করতে পারছি না।' বাবা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন সেসময়। এদিকে বাবার ডিজিডিএফআইয়ে বদলি হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বাবাকে বলেছিলেন, 'তুই আমার

“*সব সন্তানের কাছেই তার বাবা খুব প্রিয় হন। আমার বাবা শহীদ কর্নেল জামিল একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাকে একজন মানবতাবাদী মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি। এটাতো সবারই জানা যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদেরকে একেবারেই জায়গা দেয়া হত না। আমরা নিজের চোখেও দেখেছি এবং বাবা-মায়ের কাছেও গল্প শুনেছি যে, সেসময় বাঙালিদের খুব হেয় করা হত। ওই প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিতে, সেখানে যত বাঙালি অফিসার ছিলেন, তাদেরকে সব সময় সাহায্য-সহযোগিতা করার একটি প্রবণতা আমার বাবার মধ্যে ছিল*”

নয়নের মনি। তুই আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছিস, আমার খুব কষ্ট লাগছে। কিন্তু তোর মতো একজন দক্ষ ইনটেলিজেন্স অফিসারকে ডিজিডিএফআইয়ের প্রয়োজন। আমি নিজের স্বার্থের জন্য দেশের ক্ষতি করতে চাই না।'

প্রশ্নঃ সেই কালো রাত্রির কথা বলুন।

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ আসলে এই অপতৎপরতাটা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করার মতো আরও একটি বিষয় রয়েছে। আর সেটা হলো– মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের (যিনি ৭৫ পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন) একটা ক্ষোভ ছিল যে, উনি সামরিক বাহিনীর প্রধান হতে পারলেন না। কারণ তিনি জেনারেল শফিউল্লাহ থেকে এক নম্বর সিনিয়র ছিলেন। সেসময় সেনাবাহিনীতে যারা কাজ করতেন, তারা এ বিষয়টি বেশ বুঝতে পারতেন।

১৯৭৫ সালে বাবা তখনও সামরিক সচিবই (মেলেটারি সেক্রেটারি) ছিলেন। সে সময় আমরা গণভবনের ভেতরেই থাকতাম। আমার বাবা বিকেলে অফিস থেকে ফিরে টেবিলে খাবার খেতে খেতে মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন। ঘটনার আগেও প্রায়ই তিনি বলতেন, বঙ্গবন্ধু যে কি করছেন, আমার কথা একদম শুনছেন না। নিরাপত্তার বিষয়টা একেবারেই মানেন না। আমি এত করে বলছি গণভবনে এসে থাকতে (বাবা সব সময় বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট থাকতেন)। ৩২ নম্বরে সেভাবে নিরাপত্তাও দেয়া যাচ্ছে না। ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যতই বাড়াই না কেন, সেটা গণভবনের মতো হবে না। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে!

বঙ্গবন্ধু কিছুতেই সেসময় গণভবনে আসতে চাননি। তিনি তখন বাবাকে বলেছিলেন, জামিল যে কী বলিস, আমাকে কে মারবে, বলতো? এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই তিনি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতেন সব সময়। পরবর্তী সময়ে বাবা গণভবনে কিছুটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে পেরেছিলেন। এর আগে গণভবনে যে কেউই সরাসরি ঢুকে যেতে পারত। সেসময় বাবাই গেটে নাম লিখে ঢোকা, তল্লাশির ব্যবস্থাসহ আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসা– এ পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করেন। তখন সামরিক সচিব হিসেবে বাবা বলতেন যে, বঙ্গবন্ধু একদম আমার কথা শুনছেন না। কিছু একটা ঘটলে, একটা গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকে লাগবে আর একটা আমার বুকে। আমার ধারণা, বাবা সম্ভবত এ ধরনের একটা ষড়যন্ত্রের কথা আগে থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

সেদিন (শুক্রবার) মধ্যরাতে (আনুমানিক সময় ভোর ৪টার পরে) টেলিফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বাবা-মায়ের শোবার ঘর আর আমাদের (আমি ও আমার সেজ বোন শ্বেতা) শোবার ঘর পাশাপাশি ছিল। ফোনের আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে বাবার ঘরে গেলাম। আমাদের বাসার হটলাইনটা ছিল বাবার শোবার ঘরে। তখন দেখতে পেলাম, রেড ফোনটা বাজছে (যেটাতে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যেত)। মা ফোন ধরেই বাবাকে বললেন, এই তাড়াতড়ি ফোনটা নাও, বঙ্গবন্ধু কথা বলবেন। এপাশ থেকে বাবাকে বলতে শুনলাম, ফোর্স নিয়ে আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি একদম চিন্তা করবেন না, স্যার। আপনি যেখানে রয়েছেন ওখান থেকে একটুও নড়বেন না। এটাই হটলাইনে ওনার সঙ্গে বাবার শেষ কথা ছিল।

সেসময় ৩২ নম্বর বাড়ির সব ফোন লাইন কাটলেও হটলাইনটা কাটতে পারেনি ওরা (বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা)। বঙ্গবন্ধুর ফোন রেখেই বাবা আর্মি চিফ জেনারেল শফিউল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজনকে ফোন করলেন। এসময় সিনিয়র-জুনিয়র প্রটোকল ভেঙেই (কর্নেল শফিউল্লাহ মুক্তিযুদ্ধ করে সিনিয়র র‍্যাঙ্ক পান। কর্নেল জামিল সেসময় পাকিস্তানে থাকার কারণে পরবর্তীতে বাংলাদেশে এসে র‍্যাঙ্ক পেলেন না) বাবা বললেন, শফিউল্লাহ, আমি এক্ষুণি ৩২ নম্বরের দিকে যাচ্ছি। তুমি ফোর্স পাঠাও। তখন জেনারেল শফিউল্লাহ বলেন, ঠিক আছে জামিল ভাই, আমি ফোর্স পাঠাচ্ছি, আপনি যান। ফোন রেখেই বাবা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে (সিভিল ড্রেসেই) দোতলার সিড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

সেই সময় আমার মা বাবাকে বললেন, তুমি কী যাবেই? মায়ের এ প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হয়ে বাবা বললেন, কী বলছো তুমি? বঙ্গবন্ধু এরকম বিপদে আর আমি যাব না? এটা কি হতে পারে? এটা বলেই দ্রুত নিচে নেমে আমার বড় বোনের কাছে এক গ্লাস পানি চাইলেন। বড় বোন পানি আনতে আনতে বাবা একটা সিগারেট খেয়ে নিলেন। পানি খাওয়া শেষ করেই তিনি আমার মাকে বললেন, আমার মেয়েদেরকে দেখে রেখ, আমি আসি। এসময় আমাদের ড্রাইভার আইনুদ্দিন পোর্চে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। বাবা গাড়িতে চড়ে আমাদের বাসার দেয়াল ঘেষা প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন (ওরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল)। ওরা রওনা হওয়ার পরই বাবা পেছনে পেছনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তো সবকিছুই ইতিহাস।

সেদিন সোবাহানবাগের কাছের রাস্তার ওপর ট্যাঙ্কসহ ব্যারিকেড বসানো হয়। গাড়ি থেকে নেমে বাবা সামনে এগিয়ে গিয়ে সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সুবেদার মেজরকে দেখতে পান। এসময় সোবাহানবাগ মসজিদের সামনে বাবাকে গাড়িতে বসা দেখে সৈন্যরা বলে যে, স্যার, আপনি আর সামনে যাবেন না। তখন নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে বাহিনী নিয়ে সামনে এগুনোর নির্দেশ দেন বাবা। এমন সময় মেজর বজলুল হুদা ওখানে দাঁড়ানো এক সুবেদার মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজ দ্যাট? ওই সুবেদার মেজর কিছু বলার আগেই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমার বাবা বললেন, দিস ইজ কর্নেল জামিল। সঙ্গে সঙ্গে মেজর হুদা ওই সুবেদার মেজরকে বললেন, শ্যুট হিম। তখন সুবেদার মেজর বললেন, আমি পারবো না, স্যার। তখন মেজর হুদা নিজেই স্টেনগান হাতে নিয়ে আমার বাবাকে ব্রাশ ফায়ার করেন। গাড়িতেই বসা ছিলেন আমার বাবা। বুকটা একদম ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির সিটের ওপরেও গুলি লেগেছিল। এসময় গাড়ির চালকের আসনে বসা আইনুদ্দিন ভাই সামনে থেকে তিনবার বাবার মুখ থেকে 'লা ইলাহা....' শুনতে পান। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সোবাহানবাগ মসজিদের তৎকালীন ইমাম সাহেবও বাবার কলেমা পড়ার সাক্ষী হন।

এদিকে বাবা কোথায় খোঁজ করছেন আমার মা! গণভবনে বাবার অফিসে ফোন করছেন তিনি। সেসময় যারা এডিসি ছিলেন তারা ফোনও তুললেন। তবে কেউ বাবার খবর দিতে পরছিলেন না। এসময় রেডিওতে ঘোষণা আসছে- মেজর ডালিম ঘোষণা করছে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। খন্দকার মোশতাক নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ততক্ষণে। নতুন কেবিনেট ঘোষণা করা হচ্ছে। তখন আইনুদ্দিন ভাই এসে একনাগাড়ে কাঁদতে লাগলেন। কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। আমার মা বললেন, আইনুদ্দিন তুমি তোমার স্যারকে কোথায় রেখে এসেছ? তুমি একা কেন এসেছ? আর তুমি কাঁদছো কেন? কোন কথা না বলে আইনুদ্দিন ভাই কেঁদেই চলেছেন। তারপর প্রায় দুপুর ২টার দিকে আমার মা তখন নামাজ পড়ে দোয়া করছেন। এমন সময় জেনারেল শফিউল্লাহ মাকে ফোন করে বললেন, ভাবি সম্ভবত জামিল ভাই আর নেই। উনি পুরো কথাটাও শেষ করতে পারলেন না। মা তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

এরপর দু'জন সামরিক অফিসার এল আমাদের বাড়িতে। তখন সারা শহরে কার্ফ্যু চলছিলো। এরমধ্যেই আমাদের সবাইকে আমার বড় চাচা জামাল আহমেদের লালমাটিয়ার বাড়িতে নিয়ে গেলেন ওই অফিসাররা। ওখানে রাত ১১টা পর্যন্ত আমরা বাবার মরদেহের জন্য অপেক্ষা করি। সেসময় সামরিক বাহিনীর কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাবার মরদেহ দেয়ার বিষয়টির মধ্যস্থতা করছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন ফারুকের সঙ্গে মধ্যস্থতাটি করেন।

বাবাকে ওরা গাড়িতেই ব্রাশ ফায়ার করেছিল। ড্রাইভার আইনুদ্দিন ভাই পরিস্থিতি দেখেই গাড়ির চাবি নিয়ে চলে এসেছিলো। গাড়িটা তখন আর দেয়নি ওরা। চাবি না থাকায় গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ৩২ নম্বরের ড্রাইভওয়েতে রেখে যায় ওরা। সাড়ে ১১টা থেকে পৌনে ১২টার দিকে বাবার মরদেহ নিয়ে আসা হলো। বাবারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খোকন কাকু গিয়ে (বাবার প্রিয় নিশান প্রিন্স থেকে) মরদেহটা নিয়ে আসেন বড় চাচার লালমাটিয়ার বাসায়। আমি বাসার ওপর থেকে কিভাবে যেন নিচে নেমে গেলাম। গাড়ির ভেতরে বাবাকে শোয়ানো অবস্থায় দেখলাম। গাড়ির জানালা দিয়ে পা দুটো বের হয়ে ছিল (উনি বেশ লম্বা ছিলেন আর গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল। কাছে গিয়ে পা'টা ধরলাম, দেখলাম ঠাণ্ডা। বুঝতে পারলাম বাবা আর নেই। এরপর অনুমতি নিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ক্যান্টনমেন্টের বাসায় বাবার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। ওনার বাসার গ্যারেজেই বাবাকে গোসল করানো হল।

কার্ফ্যুর কারণে ওই দিন ঢাকার সব কিছু বন্ধ ছিল। গোসলের পর কাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে– এমন সংকটে কয়েক দিন আগে আমার বড় চাচীর আমেরিকা থেকে আনা একটা সাদা বিছানার চাদর ও খালেদ মোশাররফের স্ত্রীর আজমির শরিফ থেকে আনা আতর দিয়ে বাবার কাফন সারা হলো। কাফনটা হওয়ার পরই আমাদের ডাকা হয় বাবার মরদেহ দেখার জন্য। সেনা সদস্যরা বন্দুকসহ পজিশন নিয়ে বাবার মরদেহ ঘিরে রেখেছিল। সেসময় আমাদের পরিবারের সবাইকে একটা শর্ত দেয়া হয়েছিল-'আমরা কেউ কাঁদতে পারবো না, কেউ কিছু বলতে পারবো না, এমনকি বাবাকে ধরতেও পারবো না।'

আমরা সবাই গেলাম। সেসময় আমার মা বাবার মাথার কাছে গিয়ে বসলেন। তখনও পর্যন্ত বাবার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ চলছিলো (ভোর ৫টা থেকে রাত ১২টা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত)। শহীদের রক্ত পড়া সহজে থামে না- এ কথাটা সেদিন আবারও প্রমাণ পেলাম। কাফনের কাপড়টা লাল হয়ে গিয়েছিল।

ওটা দেখে আমার বড় বোন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তখন পাহারায় থাকা সেনারা বললেন– আপনারা একদম কাঁদবেন না। ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। সেসময় বাবার পাশে আমার মা হাটু গেড়ে, নিথর বসেছিলেন। চোখ থেকে এক ফোটা পানিও বের হয়নি (স্বভাবতই কাঁদছিলেন কঙ্কা)। ওই মুহূর্তটা যে কী নির্মম ছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। রাত প্রায় ১-২টার দিকে বনানী সেনাবাহিনীর কবরস্থানে চুপি চুপি বাবাকে দাফন করা হয়।

প্রশ্নঃ এরপর আপনাদের পরিবারের সংগ্রামের কথা বলুন।

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ এরপর আর এক যুদ্ধ শুরু হলো আমার মায়ের। তৎকালীন আর্মি হেড কোয়ার্টার আমার বাবার মৃত্যু সনদে (ডেথ সার্টিফিকেট) লেখে যে, আমার বাবা কর্নেল জামিল ক্রস ফায়ারে মারা যান। সেসময় আমার মাকে জোরপূর্বক ওই সনদে সই করিয়েছিলো ওরা (বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা)। তা না হলে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা, পেনসন, র‍্যাশন কোন কিছুই পাওয়া যাবে না বলে হুমকি দেয় ওরা। সেই রুঢ় বাস্তবতায় মা চার সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বাবার মৃত্যু সনদে সই করার কঠিন সিদ্ধান্তটি নিতে বাধ্য হন।

এদিকে ৪০ দিন পর মা বুঝতে পারলেন তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা। আট মাস পর আমার ছোটবোন হল। তখন আমরা চার বোন। আমার বড় বোন তনু , আমার পরবর্তী ছোট বোন শ্বেতা আর সবার ছোট বোন কারিশমা। এসময় থেকেই আমাদের পরিবারের প্রকৃত যুদ্ধ শুরু। আমরা ১৫ই আগস্টের দিন থেকে প্রায় এক বছর পর্যন্ত আমার বড় চাচার লালমাটিয়ার বাসায় ছিলাম। পরে মা অনেক চেষ্টার পর একটি পরিত্যক্ত বাড়ি তার নামে অনুমোদন পান।

বাবা চলে যাওয়ার পর মা যখন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করলেন, তখন সেনাবাহিনীতে সেসময়কার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছিলেন–ওনাকে (আমার মাকে) মহিলা অধিদফতরে একটা চাকরি যোগাড় করে নিতে! মা যখন পুরোপুরি ব্যবসা শুরু করলেন তখন কেউ তাকে কাজ দিতে চাইতো না। নানা বাহানা করতো। পরবর্তীতে উনি পুরোপুরি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজেই মনোনিবেশ করেন। এবং পাশাপাশি বিএডিসিতে ইনডেনটিং-এর কাজও চালিয়ে যান। বাবার চলে যাওয়ার পর থেকেই সব সময় বাধার মধ্যেই ছিলাম আমরা। যেমন- ১৯৭৫'র ৭ নভেম্বরে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আমার মা সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেসময় ওখানে আমার মাকে খুঁজতে এসেছিল ওরা। আমরা সবাই তখন পালিয়ে ছিলাম। মা আর আমার বড় বোন আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় এবং আমি আর আমার সেজ বোন আরেক আত্মীয়ের বাসায় পালিয়ে ছিলাম।

পরবর্তীতে (১৯৭৯ সালে) আমাদের বাসায় বড় ধরনের একটা ডাকাতি হয়। বাবার অনেক জরুরি দলিল-পত্র সেসময় হারিয়ে যায়। এভাবেই নানা প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আমাদের চার বোনকে মানুষ করে তুলেছেন আমার মা। এবং একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রাচারও চালিয়ে গেছেন তিনি। আমার মতে, মা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মান নিয়ে এদেশে থেকেছেন।

প্রশ্নঃ ৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর প্রচারণায় আপনার মায়ের ভূমিকা কেমন ছিলো?

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ এদেশে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে শুরু থেকেই আমার মায়ের অনেক অবদান রয়েছে। আমার বাবা-মা একই মাপের মানুষ ছিলেন। ভীষণ সংগ্রামী ও স্পষ্টবাদী। আমি বলবো, আমার মা একজন মহিয়সী নারী। সেই ৭৫-এ স্বামী হারিয়ে একটি মেয়ের জন্ম দিলেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে চার চারটি মেয়েকে মানুষ করেছেন। পাশাপাশি ভীষণ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রচারণার কাজও চালিয়ে গেছেন। এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত (২০১২ সাল) সরব ছিলেন তিনি। ১৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশে সবাই নিষ্ক্রিয় ছিল। বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে (প্রায় নিষিদ্ধ হওয়ার পর্যায়ে) ভয় পেত সবাই। এ সময়ের মধ্যেই খবরের কাগজগুলোতে আমার মায়ের ৪-৫টা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। তাতে মা স্পষ্টভাবে সব কিছু বিস্তারিত বলেছেন। একটুও ভয় পাননি। সেসময়গুলোতে আমাদের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের অনেক প্রস্তাব আসতো। কিন্তু আমার মা সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলতেন, যদি আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাই, তাহলে আমার স্বামীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না এবং বঙ্গবন্ধুর জন্য দেশে যে কাজ করা দরকার– সেটাও আর হবে না। বঙ্গবন্ধুর জন্য তিনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন– এটার জন্য মোটেও আক্ষেপ ছিল না তার। বরং এজন্য গর্ববোধ করতেন তিনি। আমরা মাকে বলতে শুনেছি, আমার স্বামী বাঙালি জাতির কলঙ্ক ঘুঁচিয়েছেন।

আমার মা আঞ্জুমান আরা জামিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া-এর সংসদ সদস্য হন (১৯৯৬ সালে)। বেঁচে থাকতে উনি কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ নামে একটি ফাউন্ডেশন করেছিলেন। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মারা যান।

প্রশ্নঃ সেসময় আপনাদের চার বোনকে কি কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে?

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ পরিবারে ছোটবেলা থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার কথা শুনে বড় হয়েছি। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে প্রায়ই আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এরকমই একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন আমি এসএসসি পাশ করে চারুকলায় ভর্তি হতে গেলাম। ভর্তি পরীক্ষার ভাইভা চলছিল। সেসময় চারুকলার পরিচালক ছিলেন আমিনুল ইসলাম স্যার। ওই ভাইভা প্যানেলে সেদিন হাশেম খান স্যারও ছিলেন (তিনি প্রাচ্যকলার আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন)। বোর্ডে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি আফরোজা জামিল কঙ্কা বলতেই উনি অন্য কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জানতে চাইলেন- তুমি গান গাইতে পার? আমি সম্মতি জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে একটি রবীন্দ্র সংগীত গাইলাম। এবারও কেউ কিছু বলার আগেই হাশেম স্যার বললেন, আচ্ছা, এবার তুমি আসতে পার। হাশেম স্যার সেসময় আমাকে কিছু না বললেও বেশ কিছু দিন পরে বলেছিলেন– ওই সময় আমাকে চারুকলায় ভর্তি না নেয়ার একটা সিদ্ধান্ত ছিল। সেসময় স্যারের শক্ত সুপারিশের কারনে আমি চারুকলায় ভর্তির সুযোগ পাই।

বাবার অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবারকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের পরিবারকে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (আমি হাসিনা আপা বলে ডাকি) ২০১০ সালে তৎকালীন ডিজিডিএফআইয়ের ডিজি জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবরের উদ্যোগে শহীদ কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদকে বীরউত্তম (মরণোত্তর) খেতাব প্রদান করেন। এর পাশাপাশি বাবাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদেও ভূষিত করেন (বাবা যেদিন মারা গেলেন সেদিন সকালেই স্থগিত রাখা র‍্যাঙ্কটা আনুষ্ঠানিকভাবে তার পাওয়ার কথা)। একইসঙ্গে ৫০ হাজার টাকাও দেন।

প্রশ্নঃ আপনার বোনদের সম্পর্কে বলুন। বাবার সঙ্গে কাটানো কোন মুহূর্ত মনে পড়ে কি?

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ আমরা চার বোন। বড় বোন তাহমিনা এনায়েত তনু ঢাকায় থাকেন। ব্যবসা করছেন তিনি। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার সুখী সংসার। আর চিত্রশিল্পী হিসেবেই আমার (আফরোজা জামিল কঙ্কা) পরিচয়। আমিও দুই ছেলে ও স্বামীর সংসার নিয়ে আছি। সেজো বোন ফাহমিদা আহমেদ শ্বেতা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে। সেখানে সে ব্যবসা করছেন। আর সবার ছোট বোন ক্যারিশমা জামিলও পেশায় আর্টিস্ট। সেও এক মেয়ে নিয়ে দেশেই থাকে।

বাবাকে নিয়ে কোন বিশেষ স্মৃতির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাবা ছিলেন একজন সেনা কর্মকর্তা। দায়িত্ব পালনের স্বার্থে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও বাবা যতটুকু সময় পেতেন আমাদের সঙ্গেই কাটাতেন। আর সব সময় খুব হাসিখুশি থাকতেন তিনি। রোববার ছুটির দিনগুলোতে সকালবেলায় আমার মা মজার মজার নাস্তা বানাতেন। আর আমরা সবাই মিলে সেই নাস্তা খেয়ে বাবার সঙ্গে আমাদের নিশান প্রিন্স গাড়ি পরিষ্কার করতাম। বাবা যখন কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন মাঝেমধ্যে আমাকে বলতেন, মা আমার পিঠটা চুলকে দাও তো। তখন আমি নখ দিয়ে বাবার পিঠে বিভিন্ন ছবি আঁকতাম আর জিজ্ঞাসা করতাম– বলো এটা কিসের ছবি? ওই মুহূর্তগুলো খুব মনে পড়ে।

প্রশ্নঃ একজন শহীদ সৈনিকের সন্তান হিসেবে সরকারের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন কি?

আফরোজা জামিল কঙ্কাঃ একজন শহীদ বীর সৈনিকের সন্তান হিসেবে এ চিন্তাটা খুবই সঙ্গত যে, এরকম একটি নির্মম ঘটনার মধ্য দিয়ে যদি সেদিন দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন না হতো– সেক্ষেত্রে আমার বাবাকেও হয়তো জাতি অন্যভাবে মূল্যায়ন করত! সময় বিবেচনায়, দেশের জন্য আমার বাবার যে ত্যাগ-আত্মউৎসর্গ– এ সত্য সবার জানা উচিত বলে আমি মনে করি। তবে এতটা সময় পেরিয়ে এসে এটুকু বলতে পারি যে, একজন বীর সৈনিককে কিভাবে সন্মাননা জানানো যায় সেটা জাতিই বিবেচনা করবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দৈনিক সংবাদে কর্মরত

তাঁর মৃত্যুর পরে

রশীদ হায়দার

আমার এই প্রথম টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া। ১৯৯৫ সালের ১৪ আগস্ট। মাইক্রোবাস ও গোপালগঞ্জের সার্কিট হাউসে আমাদের অনেকেরই আলোচনার বিষয় হয়– এরকম একটি জায়গা থেকে ওইরকম একটি বিশাল মানুষ বেরোলেন কী করে।

চিন্তা করে দেখা যাক বর্তমান জেলা শহর গোপালগঞ্জের কথা। এটাকে আমি এখনও উন্নত মহকুমা বলতে রাজি নই, শহরে একটিই মাত্র রাস্তা, তাও সেটি মাওয়া হয়ে গেলে খুলনা পিরোজপুর যাওয়ার হাইওয়ে। শহর সবেমাত্র গড়ে উঠছে। সেই শহর থেকে টুঙ্গিপাড়ার দূরত্ব আঠারো কিলোমিটার। অনুন্নত জেলার আরো অনুন্নত গ্রামের ছেলে মুজিব, শেখ মুজিব, শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতির জনক। টুঙ্গিপাড়া এখন বাঙালি জাতির তীর্থভূমি। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণের তীর্থস্থান কথাটি উল্লেখ আছে, গিয়ে দেখলাম কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। আমরা বহু জায়গায় না গিয়ে শুধু লোকমুখে শুনে,

খবরের কাগজের বিবরণ পড়ে, যোগ-বিয়োগ করে জায়গা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলি, অজপাড়াগাঁ টুঙ্গিপাড়া সম্পর্কেও সে-রকম ধারণা এসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জি.টি. হাইস্কুলের একপাশে মাঠে ও রাস্তায় আমি যানবাহন গোনার চেষ্টা করেছিলাম। গোটা পঞ্চাশেক বাস, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, প্রাইভেটকার গোনার পর আর গুনিনি, কারণ অগণিত যানবাহন গোপালগঞ্জ-পিরোজপুর হাইওয়ের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সেইসব বাহন এসেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কোনো বাহন হয়তো রওনা দিয়েছে রাতে, কোনোটা সকালে। ওই দিনেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কবর জিয়ারত করে ফিরে যাবে। সারাদিনই গাড়ি এসেছে, টুঙ্গিপাড়ায় লাখো মানুষের ঢল নেমেছে।

জি.টি. হাইস্কুল ওই হাইওয়ের পাশে, স্কুল থেকে টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আরো মাইলখানেক ভেতরে। জি.টি. অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া হাইস্কুল, স্কুলের সামনেই বিশাল মাঠ বলে মিটিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওখানেই হলো। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৫ সালে, তখন ছিল গিমাডাঙ্গা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, বঙ্গবন্ধু এই স্কুলেই ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছিলেন। বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে আমার সরাসরি পরিচয় থাকার সুবাদে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, গরমে বৃষ্টিতে ধুলোকাদা ভেঙে লম্বা গড়নের একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে আসছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে ছেলেদের ওই প্রাইমারি স্কুল পর্যন্তই যাওয়া, অধিকাংশই ঝরে যায়, শহরে ভালো স্কুল-কলেজে পড়তেই বা যায় ক'জন। জি.টি. হাইস্কুলের পাকা ভবন হয় ১৯৯০ সালে।

বলেছি লাখো মানুষের ঢল। স্কুলের মাঠে, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। গোপালগঞ্জ থেকে আমরা যখন টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পৌঁছেছি, তখন লোকে লোকারণ্য, লোকে কবরে পুষ্পমাল্য দিচ্ছে, ফাতেহা পাঠ করছে, দোয়া করছে। ড্রয়িং রুমে শেখ হাসিনা, ডান হাতে তসবিহ, একটি সিঙ্গেল সোফায় বসে, তাঁর ডানপাশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান। শেখ হাসিনা ও জিল্লুর রহমানের মাঝখানে বঙ্গবন্ধুর একটি বড় ছবি। ঘরে উপস্থিত আছেন প্রফেসর কবীর চৌধুরী, বিচারপতি কে এম সোবহান, সৈয়দ শামসুল হক, প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান। গিয়ে হাজির হলাম আমি, কবি রফিক আজাদ ও কবি মহাদেব সাহা। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই আছেন, শেখ হাসিনা সবার সঙ্গে কথা বলছেন ও মিলাদ-মাহফিলের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন। একসময় উঠে গেলেন মিলাদে অংশ নেবেন বলে। তার আগে বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ। এদিকে মওলানা সাহেব পবিত্র কোরআন পাঠ করছেন, একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ, এ যেন জন্মদিনের অনুষ্ঠান নয়, যেন শোকের আবহে গড়া এক বিমর্ষ বাংলাদেশ। মিলাদে এক পাশে মেয়েদের জায়গা, আরেক পাশে পুরুষদের। পুরুষদের মুখোমুখি ও মেয়েদের বাম পাশে বঙ্গবন্ধুর কবর। বঙ্গবন্ধুর কবরের পাশেই তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা শেখ সাহেরা খাতুনের পাশাপাশি জোড়া কবর। বঙ্গবন্ধুর কবরের ওপরে কোনো ছাদ নেই, আকাশই ছাদ হয়ে ছেয়ে আছে আকাশেরই মতো বিশাল আরেক অস্তিত্বকে। মিলাদ চলছে, লোক আসছে, বিরাম নেই। আমরা প্রায় বারোটা পর্যন্ত থাকতে থাকতেই দুই দফা মিলাদ হলো। ইতোমধ্যে শেখ

জি.টি. হাইস্কুল ওই হাইওয়ের পাশে, স্কুল থেকে টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আরো মাইলখানেক ভেতরে। জি.টি. অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া হাইস্কুল, স্কুলের সামনেই বিশাল মাঠ বলে মিটিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওখানেই হলো। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৫ সালে, তখন ছিল গিমাডাঙ্গা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, বঙ্গবন্ধু এই স্কুলেই ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছিলেন। বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে আমার সরাসরি পরিচয় থাকার সুবাদে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, গরমে বৃষ্টিতে ধুলোকাদা ভেঙে লম্বা গড়নের একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে আসছে।

বঙ্গবন্ধু আরো পড়তে গিয়েছিলেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে, পরে ভর্তি হয়েছিলেন মিশনারি স্কুলে। আমি ইচ্ছে করেই জি.টি হাইস্কুল ও শহরে বঙ্গবন্ধু কলেজ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কারণ স্কুল ও কলেজের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর পায়ের স্পর্শ ছাড়া ভবনদুটোতে তাঁর কোনো স্পর্শই নেই। থাকার কথাও নয়। বঙ্গবন্ধুর প্রাইমারি স্কুলের নামের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়া যুক্ত হয়েছে। কিন্তু শহরের স্কুলের মাঠেই এখন বঙ্গবন্ধু কলেজ। আমি মনে মনে দেখতে চেষ্টা করেছি একদা এই মাঠে ও রাস্তায় মুজিব নামের একটি ছেলের কীরকম পদচারণা ও কর্মতৎপরতা ছিল। গোপালগঞ্জের আইনজীবী ধলু রায় চৌধুরী জানালেন গোপালগঞ্জের কোথায় মুজিবের পায়ের স্পর্শ নেই। আর আমি মনে মনে বলি, সারা বাংলাদেশের সব জায়গাতেই তো মুজিব ও বঙ্গবন্ধু একাকার হয়ে মিশে আছেন। গোপালগঞ্জ শহরে যে বাড়িতে থেকে বঙ্গবন্ধু লেখাপড়া করেছেন, সে বাড়িটিও এখন নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা পুড়িয়ে দিয়েছে।

তেমনি পুড়িয়ে দিয়েছে তাঁর টুঙ্গিপাড়ার বাড়িও। ১৮ মার্চে বঙ্গবন্ধুর বর্তমান দোতলা পাকা বাড়ির নিচতলায় ড্রয়িংরুমে আমি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: বঙ্গবন্ধু যে ঘরে জন্মেছিলেন, সেই ঘরটি কি আছে? শেখ হাসিনা হেসে বললেন : এই ড্রয়িং রুমটিই সেই ঘর। সেই ঘরের পোড়া টিন ওই ওখানে।

দেখলাম তাঁর বিশাল বাড়ির বিরাট রান্নাঘরের বেড়া হয়েছে সেই পোড়া টিন। এই পাকা দোতলা ভবন কবে হয়েছে জিজ্ঞেস করিনি। কারণ আমি পুরনো অস্তিত্বে পেতে চাইছিলাম বঙ্গবন্ধুকে।

হাসিনা দুই দিনব্যাপী শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বাড়িরই অন্য একটা প্রাঙ্গণে। যে প্রাঙ্গণের পাশেই রয়েছে বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষদের বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ। আমার শুধু বিস্ময় এইরকম একটি পাড়াগাঁয়ে অমন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার বসতি পত্তন করেছিলেন কেন? তাঁর পূর্বপুরুষ কি জমিদার ছিলেন? না, তা নয়। কিন্তু পুরনো বাড়িটি দেখে যে কেউ বলবে, আগের জমিদারদের আমলে এ রকম ছোট ছোট ইটের প্রাসাদ গড়া হতো।

দুপুরে গোপালগঞ্জ ফিরে এসে, খেয়ে, বিকেলে আবার গিমাডাঙা-টুঙ্গিপাড়া হাইস্কুল মাঠে। ওখানে জনসভা। প্রধান অতিথি শেখ হাসিনা, সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান। সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে সাড়ে ছয়টায় শেশ; বক্তা মোট ২০ জন। সবার বক্তব্যেই প্রধানত বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁর গুণাবলি ও মহত্ত্বের কথা এবং বাংলাদেশের স্থপতির মূল্যায়ন, তবে শেখ হাসিনার বক্তব্যে সেই অমোচনীয় কষ্টের কথা, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর ভোরে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর পিতৃমাতৃহীন হওয়া।

আমি চিন্তা করেই গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর লাশ গোসল, জানাজা, দাফনের কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের কারো একজনের সঙ্গে কথা বলা। সুযোগটি ঘটিয়ে দিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু স্কুল সহপাঠী মীর্জা। বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ, পুলিশ বিভাগে ছিল, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকত ছায়ার মতো, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর জেলও খেটেছে, কিন্তু আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে একচুল নড়েনি। এখন 'বাংলার বাণী'তে থাকলেও শেখ সেলিমের সঙ্গেই সর্বক্ষণ। জি.টি. স্কুলমাঠেই মীর্জার সঙ্গে দেখা ২২ বছর পর। মীর্জাই শেখ সেলিমের বাড়ির একজনকে পাঠাল, বঙ্গবন্ধুর লাশ জানাজা গোসল ইত্যাদি কাজ করেছে এমন

যাকে পাও, সঙ্গে নিয়ে আসবে। একটু পরেই মীর্জা জানাল : রশীদ, তুই যেরকম চাইছিলি, সেইরকমই একজন এসেছে। তিনি রমার বাপ। আঞ্চলিক উচ্চারণে রমা আসলে রহমান। রমার বাপই আবদুল মান্নান, তাঁর কাছে জানতে চাইলাম : যা জানেন সব বলুন।

আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল যিনি জানাজা পড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে কথা বলা। আগেই শুনেছিলাম, ওখানে গিয়েও শুনলাম তিনি মারা গেছেন বছর দেড়েক আগে। তাঁর নাম শেখ আবদুল হালিম। টুঙ্গিপাড়া জামে মসজিদের ইমাম।

আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন আবদুল মান্নান। বুঝতে পারি সেই ভয়ংকর দৃশ্য বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি শুনতে চাই, শোনাতে চাই। বঙ্গবন্ধুর জানাজা, দাফন ইত্যাদি বিবরণ এর আগে দু'একটি কাগজে ছাপা হয়েছে, আমি পড়েছি সে বিবরণ। আবার বলি আমি সেইরকম একজন মানুষের মুখ থেকে শুনতে চাই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁর সঞ্চয়। একসময় চোখ মোছেন আবদুল মান্নান।

কি বলবো বাবা, সে কথা বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে যান তিনি: ওইদিন আমরা দুপুরের দিকে নদীর ধারে মাটি কাটছিলাম। সকাল থেকেই শোনাশুনি শুনছি মুজিবকে নাকি মেরে ফেলেছে। যাদের রেডিও আছে, তারা শুনেছে। কিন্তু আমরা শুনি নাই। বিশ্বাস হতে চায় না, মুজিবকে কে মারবে, কেনই বা মারবে। এমন সময় শুনি আকাশে ভটভট শব্দ। হেলিকপ্টারের শব্দ। মুজিব আগে আসতো হেলিকপ্টারে; ওই শব্দ আমরা চিনি। শব্দ আস্তে আস্তে কাছে আগায়। দেখি দুইটা হেলিকপ্টার; ওই থানার মাঠে নামলো হেলিকপ্টার দুইটা। নামার সাথে সাথে বিশ পঁচিশ জন মিলিটারি লাফ দিয়ে নেমে মাঠ ঘিরে ফেললো। হেলিকপ্টারের শব্দে গ্রামের অনেক লোক আসতে থাকলো, কিন্তু মিলিটারিরা রাইফেল তাক করে সবাইকে দূরে থাকার হুকুম দিয়ে বললো, কাছে এলে গুলি করা হবে। আমরা যারা মাটি কাটছিলাম তাদের কয়েকজনকে ডাকলো মিলিটারি। এর মধ্যে হেলেকপ্টার থেকে একটা বড় কাঠের বাক্সের মতো নামালো। আমরা কাছে গেলে হুকুম দিলো, এটা মুজিবের বাড়িতে নিয়ে চলো।

কি আছে? কী আছে এর মধ্যে?

আমাদের একজন কথাটা জিজ্ঞেস করলে ধমক মারে মিলিটারি: তা দিয়ে তোমাদের কাজ কী? যা বলছি তাই করো।

মিলিটারির ধমকে সেই কাঠের বাক্স কাঁধে করে নিয়ে এলো আব্দুল হাই, নজির মোল্লা, রজব শেখ ও তোতা মিয়া। আমরা তখনও বুঝি নাই এই বাক্সেই আছে আমাদের মুজিবের লাশ। মিলিটারিরা বাড়িতে বাক্স নামানোর সঙ্গে সঙ্গে বলে: এক্ষুণি গর্ত করে পুঁতে ফেলো।

এর মধ্যে চলে এসেছেন মসজিদের ইমাম সাহেব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কি আছে এর মধ্যে?

এক মিলিটারি ধমক মারে: আপনার অতো জানার দরকার নেই। যা বলা হচ্ছে তাই করেন।

ইমাম সাহেবের এক কথা: আগে বলেন, তারপরে।

এরমধ্যে ফোনের মতো যন্ত্র দিয়ে কোথায় যেন কথা বলে মিলিটারি, তারপর বারবার বলে, তাড়াতাড়ি করো। কিন্তু ইমাম সাহেবের একক কথা– বলেন, এটা কার লাশ?

শেখ মুজিবের।

মিলিটারি বাধ্য হয়ে স্বীকার করার পর ইমাম সাহেব আবার বলেন: এটা তো মুসলমানের লাশ, না কি?

হ্যাঁ।

জানাজা ছাড়া মুসলমানের লাশ দাফন হয় কি করে?

না, না, জানাজা টানাজা চলবে না। এমনি দাফন করতে হবে।

লাশের কি গোসল হয়েছে?

মুখ চাওয়া চাওয়ি করে মিলিটারিরা। ইমাম সাহেব তখন বলেন: তাহলে কি শেখ মুজিব শহীদ? মিলিটারি সেটাও স্বীকার করে না। রাগে ফেটে পড়েন ইমাম সাহেব–মুসলমানের লাশ, গোসল নেই, শহীদ বলে স্বীকার করবেন না, অসম্ভব, গোসল জানাজা ছাড়া লাশ দাফন করতে দেবো না।

তখন মিলিটারি আবার ফোনের মতো যন্ত্রে কথা বলে শেষে রাজি হয় কাঠের বাক্স খুলে মুজিবের লাশ গোসল করাতে, জানাজা পড়াতে। এর আগে মিলিটারি আমাদের বলেছিলো দশটি কবর খুঁড়তে হবে। কিন্তু ওই ফোনে ঢাকা থেকে হুকুম এলো, না দশটি নয়, একটিই কবর খুঁড়তে হবে।

বঙ্গবন্ধুর লাশ গোসল করিয়েছিলেন আব্দুল মান্নান ছাড়াও ইমানউদ্দিন গাজী, মাতবর নূরুল হক ও কেরামত হাজী। আমি আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: বঙ্গবন্ধুর শরীরে কোথায়- কোথায় গুলি লেগেছিলো। প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে উঠলেন আবদুল মান্নান।

বাবারে, সে কথা কওয়া যায় না, সেই বুক দেখা যায় না। গুলিতে বুকের খাবলা খাবলা মাংস উড়ে গিয়েছিলো, হাতের একটা আঙুল উড়ে গিয়েছিলো, পায়ের গোড়ালিতে গুলি লেগে অনেকখানি মাংস ছিলো না। সে যে কী দৃশ্য বাবা, না দেখলে বলা যায় না। আমরা একই বয়সের দুইজন, এই গাঁয় দু'জন কতো খেলেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, আর মুজিব বড় হয়ে, দেশের নেতা হয়েও আমাদের ভোলেনি, ঢাকায় তার বাড়িতে গেলে পাশে বসিয়ে জানতে চেয়েছে অমুকের বাপ কেমন আছে, তমুকের মা কেমন আছে, সমুকের অবস্থা এখন কেমন, আসার সময় পকেটে টাকা গুঁজে দিয়েছে, গায়ে হাত রেখে কথা বলেছে, সেই মুজিবের ওই লাশ দেখতে হলো, এও কপালে ছিলো।

আবদুল মান্নানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম : গোসল, জানাজা ও দাফনের কথা বলুন। আমি যে প্রশ্নই করি, করি তার মুখের দিকে চেয়ে, আমি পড়তে চেষ্টা করি তার মুখের ছবি, মুখ থেকেই অনুভব করতে চেষ্টা করি তাঁর মনের কষ্ট। বলছেন আবদুল মান্নান, হায় রে, দেশের রাজা, যে না হলে দেশ স্বাধীন হতো না, তাকে গোসল করানো হলো একটা ৫৭০ কাপড় কাচা সাবান দিয়ে। কোনো গরম পানি নাই, গোসল করানো হলো পুকুরের পানি দিয়ে।

জিজ্ঞেস করি,

কাফনের কাপড় পেয়েছিলেন?

আবার কষ্টের শ্বাস পড়ে আবদুল মান্নানের:

কি যে কন, তখন কোথায় কাফনের কাপড়? মুজিবের মার নামে যে হাসপাতাল, সেই হাসপাতালে মুজিবই কিছু পাড়ওয়ালা নতুন সাদা শাড়ি দিয়েছিলো। তার থেকে তিনটি শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে কাফনের কাপড় বানানো হয়। আড়াইটা শাড়ি লেগেছিলো।

জানতে চাই,

কফিন খোলার পর বঙ্গবন্ধুকে কি অবস্থায় দেখলেন?

দেখলাম বিছানায় চাদর দিয়ে লাশ জড়ানো। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, পকেটে রুমাল, পাইপ, তামাকের কোটা। একটা তোয়ালেও ছিলো বাক্সে। সবকিছু রক্তে কালো হয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধুর জানাজায় উপস্থিত ছিলেন ২০ থেকে ২৫ জন লোক। ভাবুন, দেশবাসী ভাবুন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার জানাজায় মাত্র ২০ থেকে ২৫ জন লোক। আমি আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞেস না করলেও অনুমান করি মিলিটারিরা জানাজায় অংশ নেয়নি, কারণ তারা অস্ত্র তাক করে অসংখ্য গ্রামবাসীকে তাড়াতে ব্যস্ত। তাদের মনে কি ভয় ছিলো? আবদুল মান্নানের কথাতেই তো বোঝা গেল তাদের ব্যস্ততা, তাদের ভয়-ভয় ভাব; ঢাকা থেকে অয়ারলেসে তাড়াতাড়ি সারো, তাড়াতাড়ি করো নির্দেশ। অস্ত্র নিষ্ক্রিয় রেখে তারা জানাজায় অংশ নেবে। মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধুর ওইসব রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন আবদুল মান্নান। লাশ দাফন হয়ে যাওয়ার পর সবার অলক্ষে তিনি বাড়ির পেছন দিয়ে, ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে চলে যান নদীর ধারে।

আবদুল মান্নান কাপড়ের রক্ত ধুয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। রাতেই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। বলছেন আবদুল মান্নান,

রাতে দেখি যে সারা ঘরে লাল পিঁপড়ে। ঘরের চালের যে কোথায় কাপড় লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে তো হাজার হাজার পিঁপড়ে, আমার বিছানায়, কাপড় ধোয়ার সময় যে লুঙ্গি পরনে ছিলো, সেটাতেও পিঁপড়ে। তখন কি করি? এর মধ্যে খবর পেয়েছি আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। ওই কাপড়চোপড়ের জন্যেই। ওই রাতেই একটা ৫৭০ সাবান জোগাড় করে সব কাপড় আবার কাচলাম। শুকানোর পর খুব গোপনে রেখে দিয়ে, একসময় একজনের হাতে মুজিবের ছোট মেয়ে রেহানার কাছে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এত বড় একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার পরও আবদুল মান্নানের দুঃখ আছে। বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত কাপড়চোপড় নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গেঞ্জিটা পড়ে গিয়েছিল। আর পাননি। শেখ রেহানার কাছে পাঠানো কাপড়চোপড়ই এখন বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামে রয়েছে।

টুঙ্গিপাড়ার যে থানার কথা বলেছি, সেই থানার দোতলায় বঙ্গবন্ধু বাড়ি এলে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। দোতলায় উঠেছিলাম। সামান্যতম নিরাপত্তাও আছে বলে মনে হলো না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা সামান্যই চিন্তা করতেন বঙ্গবন্ধু। করলে বঙ্গভবন, গণভবন ছেড়ে নিজ ভবনে থাকতেন? অন্য জায়গায় ঘাতকরা সফল হতো না।

লেখক: কথা সাহিত্যিক

আমার কলমে

বঙ্গবন্ধু

আমিনুল ইসলাম

উনিশ শ একাত্তর সাল। আমি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। আমাদের বাড়ির সামনের বাড়িতে মাটির দেয়ালে সাঁটা পোস্টার। একজন মানুষের ছবি ডানহাতের তর্জনী আকাশের দিকে। পোস্টারে লেখা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বড়দের মুখে শুনি, ওই মানুষটির নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অনেক বড় নেতা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বড়দের সাথে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম প্রতিদিন। চরমপত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরাজকণ্ঠে সংবাদ আর রক্তে আগুন লাগানো গান। দু'টি গানে শেখ মুজিবের নাম ছিল। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের গাওয়া 'মুজিব বাইয়া যাও রে'এবং অংশুমান রায়ের গাওয়া 'শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি'। হাইস্কুল-জীবন, ভার্সিটি-জীবন গেছে; কবিতা লিখেছি, গান লিখেছি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়নি। পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে যখন সাহিত্য চর্চার প্রতি মনোনিবেশ করলাম বেশি বেশি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কবিতা হয়ে উঠতে থাকল আমার কলমে।

আমি আমার 'বালকের দেখা মুক্তিযুদ্ধ' স্মৃতিকথাকে কবিতায় রূপান্তর করে নাম দিলাম 'আমার মুক্তিযোদ্ধা হতে পারা না পারার গল্প'। ৮১ লাইনের দীর্ঘ কবিতাটি দৈনিক ভোরের কাগজের সাহিত্য পাতায় প্রথম ছাপা হলো। তারপর কবিতাটি অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ কবিতা সংকলনে স্থান লাভ করেছে। কবিতাটি আমার 'জলচিঠি নীলস্বপ্নের দুয়ার' কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয়েছে পরে। কবিতাটির শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সেই পোস্টারের প্রসঙ্গ দিয়ে।

মাটির দেয়ালে সাঁটা–আসমানী সেই পোস্টারে–
মেঘের মিনারছোঁয়া আঙুলের ইশারা দেখেছিলাম;
'.....এবারের সংগ্রাম–স্বাধীনতার সংগ্রাম–'
অস্তিত্বের সবটুকু দিয়ে শুনেছিলাম এই ডাকও;
কিন্তু সে-ডাকে সাড়া দিয়ে যোদ্ধার খাতায় নিজের নামটা
লেখাতে পারিনি। আমি তখন সাড়ে ন'বছরের শিশু;
হাত ধরে কেউ আমাকে নিয়ে যায়নি ওপারে–
যেখানে আগুন-পানি সহযোগে শেখানো হতো
দুরন্ত তর্জনী ও ট্রিগারের মধ্যে অব্যর্থ সহবাসের সূত্র।
আমার বয়সকেই আমি দোষী। আমার মুক্তিযোদ্ধা
হওয়ার পথে সে-ই হয়ে উঠেছিল অলংঘনীয় বাধা।
(আমার মুক্তিযোদ্ধা হতে পারা না পারার গল্প / জলচিঠি নীলস্বপ্নের দুয়ার)

শীর্ষক কবিতা। ওই কবিতায় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ এলো প্রবলভাবে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার নিয়ে ষড়যন্ত্র এবং বিচারকদের ভূমিকার প্রসঙ্গটিও প্রচণ্ড তির্যকতায় উপস্থাপিত হলো। রংপুর থেকে এম এ বাশার সম্পাদিত 'উত্তরের একাত্তর কবিতায় স্বদেশ' কাব্য-সংকলনে কবিতাটি ছাপা হলো। আমি ওই সংকলনের ২০০ কপি সংগ্রহ করে আমার কর্মস্থলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। কবিতাটির প্রথমাংশ নিম্নরূপ:

তিরিশ বছর যায়
স্বাধীনতার স্বাদ চেটে খায় লুটেরার দল
বাতাসে স্মৃতির গন্ধ
কেঁদে যায় একাত্তর, ভাষাহীন
পা দোলায় রাজাকার
নতশির বীরোত্তম, পথভ্রষ্ট, যুদ্ধাবসানে
পরাজিত অন্তরে-বাহিরে।
খুনের বিচার চেয়ে বিড়ম্বিতা বোন
ঘাতকের হুংকারে কাঁপে তার বুকের আঁচল
বিব্রত বিচারক-ঈশ্বরের প্রতিনিধি
হতভম্ব সংসার, আল্লাহর আরশ!
(উত্তরের একাত্তর কবিতায় স্বদেশ / সম্পাদনা : এম এ বাশার)

> *একজন মানুষের ছবি ডানহাতের তর্জনী আকাশের দিকে। পোস্টারে লেখা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বড়দের মুখে শুনি, ওই মানুষটির নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অনেক বড় নেতা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বড়দের সাথে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম প্রতিদিন। চরমপত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরাজকণ্ঠে সংবাদ আর রক্তে আগুন লাগানো গান। দু'টি গানে শেখ মুজিবের নাম ছিল। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের গাওয়া 'মুজিব বাইয়া যাও রে' এবং অংশুমান রায়ের গাওয়া 'শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি'।*

কিন্তু সেটি আমার আরও পরে লেখা একটি কবিতা। দেশে সামরিক শাসনের অবসানের পর নব্বই দশকের শুরুতে যখন গণতন্ত্র এলো, দেশের প্রধান চেয়ারে আসীন হলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার নিয়ে সরকারের টালবাহানা। উচ্চাদালতের বিচারকদের অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব 'বিব্রতবোধকরণ' এবং বিচার বন্ধ বা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকা। আমি মাঠপর্যায়ে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম অনেক বছর। কোনো মামলার বিচারবিষয়ক শুনানি নিয়ে বিচারকরা একের পর এক 'বিব্রত' বোধ করতে পারেন এবং তার ফলে সেই মামলার বিচার বছরের পর বছর বন্ধ বা স্থগিত থাকে, এমনটি কখনো দেখিনি বা শুনিনি। অন্যদিকে পিতৃহত্যার বিচার চাওয়ায় বঙ্গবন্ধু কন্যাদের বিরুদ্ধে আরেকটি ১৫ই আগস্ট ঘটানোর হুমকি প্রদান। আর এসব দেখেশুনে খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধারাও নীরব। যে মুক্তিযোদ্ধরা বঙ্গবন্ধুর নামে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন, অনেকেই পেয়েছিলেন বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের নৈতিক পরাজয় দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম গভীরভাবে। তখন আমি সরকারি চাকরিতে এসে গেছি। সবকিছু দেখে-শুনে মনটা ভীষণ খারাপ। কিন্তু সরকারি চাকরি। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চাকরি হারানোর ভয়। তার চেয়ে বেশি আদালত অবমাননার অভিযোগের ভয়। এ যেন সেই রানারের অবস্থা, 'দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য উঠে!' তথাপি থামতে পারলাম না। লিখলাম 'মুক্তিযোদ্ধার সামনে' একথা বলতেই হয় যে, আমার কাছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বিষয়। এই ভাষণে মহাকালজয়ী ভাষণের সব উপাদানই রয়েছে। পাকিস্তান আমলে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ, রাজনৈতিকভাবে নিষ্পেষণ, প্রশাসনিকভাবে পীড়ন এবং সাংস্কৃতিকভাবে দমনের সব অপচেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সহ্য করতে হয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠের দুঃশাসন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিরা সংগ্রাম করে গেছে স্বাধিকার অর্জনের। বঙ্গবন্ধুকে জেলজুলুম-মামলা সহ্য করতে হয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু তিনি কোনো ভয় বা লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি।

বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন হাজার বছরের বাঙালির জন্য প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়া মহামানব। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয় বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণা, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি পাকিস্তানি শাসকদের হাতে জেলজুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছেন, বারবার তাঁর প্রাণের ওপর হুমকি এসেছে; কিন্তু তিনি কোনো ব্যক্তিগত লোভ বা লাভ কিংবা রাষ্ট্রীয় ভয়-ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। নজরুল তাঁর চিরবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে আগুন-ঝরানো প্রত্যয়দীপ্ত বক্তব্য এবং ঘোষণা দিয়ে ভেতো-ভীরু-অলস এবং সেনাবাহিনীতে চাকরি করার অনুপযুক্ত বলে ব্রিটিশ-ভারতে বহুনিন্দিত বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণ সেই বিদ্রোহী কবিতারই আরেক রূপ। বিদ্রোহী কবিতায় বাঙালির বা মানুষের শির হিমালয়কে নিচে ফেলে খোদার আসন আরশ ছাড়িয়ে সবার ওপরে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই

মার্চের সেই 'আঙুল' বা 'তর্জনী' বাঙালির ভীরুতার-কাপুরুষতার-ঘরকুনোপনার সকল বদনাম ঘুঁচিয়ে ছুয়েছিল আকাশ– যে আকাশ ছিল পরাধীনতার মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। ৭ই মার্চের সেই আঙুল সেই মেঘে আঘাত করে নামিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার বৃষ্টি। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলে' নামক সুবিখ্যাত কবিতায় ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুকে 'রবীন্দ্রনাথের মতো দীপ্ত পায়ে হেঁটে, অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন' বলে বর্ণনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এই তুলনা হওয়া উচিত বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনও ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতার দাবি করেননি। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের তেমন কোনো মিল নেই বললেই চলে। আসলে সব মিল নজরুল আর বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। এমনকি 'জয় বাংলা' শব্দটি পর্যন্ত আমরা নজরুলের কাছ থেকে পেয়েছি। ব্রিটিশরাজ যখন স্বাধীনতাকামী রাজনীতিকদের জেলে পুরে রেখেছিল, নজরুল লিখেছিলেন 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল, কর রে লোপাট'-এর মতো আগুন–ঝরানো গান যা পৃথিবীতেই এই ধরনের প্রথম গান। বঙ্গবন্ধুকে যখন জেলে আটকিয়ে রেখেছিল পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার, তখন নজরুলের সেই গানই বাঙালির প্রেরণা হয়েছিল, তারা স্লোগান দিয়েছিল, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘটনা নিয়ে লেখা আমার কবিতার নাম দিয়েছিলাম 'আঙুল ছুঁয়েছে আকাশ' যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং কবি প্রত্যয় জসীম সম্পাদিত 'দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু' নামক সংকলনে ঠাঁই লাভ করেছিল। ওই কবিতায় আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী কবিতার অসমাপ্ত উপশেষ' বলে আখ্যায়িত করেছিলাম। কারণ, নজরুল বলেছিলেন, তিনি সেইদিন শান্ত হবেন যেদিন উৎপীড়নকারীর অত্যাচার বন্ধ হবে; যেদিন 'অধীন বিশ্ব' উৎপাটিত হবে। শাসিতরা পেয়ে যাবে স্বশাসনের অধিকার অর্থাৎ স্বাধীনতা। ৭ই মার্চের ভাষণও বলা হয়েছে যে, বাঙালি যখন মরতে শিখেছেড়-তখন কেউ তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আর ফাইনাল কথা হচ্ছে, 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ!' কবিতাটি আমার 'প্রণয়ী নদীর কাছে' কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

আঙুল ছুঁয়েছে আকাশ
উৎকণ্ঠিত দিন–বাতাসের ইঙ্গিতে শিহরিত
আহ্নিকগতির পথ–বিকেলের রোদ–
শিরিষের শাখা–তালগাছে ঝুলে থাকা
বাবুইয়ের নীড়! কত নম্বর বিপদ-সঙ্কেত
ভাই? কত নম্বর? জানা নেই–জানা নেই–
জানা নেই! পথেঘাটে শুধু গুঞ্জরিত অনুমান।
তবে সকলেই জানেন–সকলেরই বৃষ্টি চায়।
বৃষ্টি চায়–রাজবাড়ীর সোনালী আঁশের চাষী
বৃষ্টি চায়– মঙ্গাপীড়িত তিস্তাপাড়ের জেলে
বৃষ্টি চায়– প্রাইমারির বেতনবিহীন মাস্টার
বৃষ্টি চায়– সুন্দরবনের বৃক্ষ-হরিণ-ময়ূর
বৃষ্টি চায়– শুকিয়ে আসা ভাওয়াইয়া গানের গলা।
কিন্তু হায়, বৃষ্টি কোথায়? পশ্চিমে ফুটে ওঠে
অগ্নিঝড়ের রঙ! কী হবে! কী হবে! তুঙ্গে
এই ব্যাকুলতা। এমন সময় অগ্নিবাণী
বিদ্রোহী কবিতার অসমাপ্ত উপশেষ–
'কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবে না.'
আবৃত্তি সহযোগে লাফিয়ে ওঠে তর্জনী
আর পড় প্রতিশব্দে গর্জে ওঠে ভীড়!
কিন্তু কোথায় গিয়ে থামবে ঐ আঙুল?
কোন্ উঁচুতে! কোন্ সে মেঘের মিনারে!
দেখতে দেখতে ঝঞ্ঝা-বজ্র-বিদ্যুৎ ভেদ করে
মহামতি আঙুল ছুঁয়ে ফেলে ঝুঁকে আসা
আকাশের গা! অমনি জমাটবন্দী মেঘ ভেঙে শুরু
বজ্রের তালে তালে মহাবৃষ্টির গান–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!'
(আঙুল ছুঁয়েছে আকাশ / প্রণয়ী নদীর কাছে)

এই কবিতাটিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অবাধ সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং সর্বশ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা চিত্রকল্পের সমাহারে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব বিষয় কবিতার অভিজ্ঞ পাঠকরা বুঝবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল নতুন প্রজন্মের মাঝে বিষয়টি আরও সহজ করে উপস্থাপন। কারণ নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি, বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম দেখেনি, অধিকন্তু নানাভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। আর নতুন প্রজন্ম সত্য ইতিহাস না জানলে জাতির ভবিষ্যৎ পথচলা আবারও অগন্তব্যে পথ হারাতে পারে। তাই একই বিষয় নিয়ে আমি লিখেছি কিশোর কবিতা 'তর্জনী' যা দৈনিক সংবাদসহ একাধিক পত্রপত্রিকায় বহুবার ছাপা হয়েছে। এই কিশোর-কবিতাটি কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো। উল্লেখ্য, বাল্যে-কৈশোরে মগজে বিশ্বাসে যা প্রবেশ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অপরিবর্তিত থাকে আমৃত্যু। সেজন্য প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের ব্যাপারটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটি নিম্নরূপ :

তর্জনী
জনে জনে প্রাণের সাগর রেসকোর্সের ঐ মাঠ!
সেই সাগরে মিললো নদী-মিললো পথ ও ঘাট।
আশেপাশের মিছিলগুলোয় উপচে-পড়া ভীড়
যোগ দিয়েছে সেই মিছিলে ফিঙ্গে ফেলে নীড়!
বজ্রধ্বনির ঢেউয়ে ভাঙে ভীড়-সাগরের পাড়
ঢেউয়ের টুঁটি ধরবে টিপে সাধ্য এমন কার!
ঝড় দেখি নাড়-তবুও ওঠে উথালপাথাল ঢেউ
ঝড় ওঠেনি– ঝড়ের চেয়েও শক্তিশালী কেউ!
তর্জনীটার ডগায় দ্যাখো তেলেসমাতির বাও
তার দোলাতে দোলে সাগর– তার নাচনে নাও।
চূড়োয় যখন প্রাণের জোয়ার উদ্বেলিত কান
ওই আঙুলটা শুনিয়ে দিলো স্বাধীনতার গান।
(তর্জনী/ অগ্রন্থিত)

এটি অপ্রিয় সত্য যে, বাঙালি জাতির একটা অংশ বড়ই অকৃতজ্ঞ। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তার ভীরুতা-কাপুরুষতা-কূপমন্ডূকতা-ঘরকুনোপনা দূর করেছেন সাহিত্যে-সংগীতে-বাস্তবজীবনে কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আর নজরুলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন: 'আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করব। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইতে পড়েছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতাপাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হইবে।' বঙ্গবন্ধু হলেন সেই 'অতি মানুষ'দের একজন এবং তাদের শিরোমণি বা দলনেতা। এই 'অতি মানুষ' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির স্বাধীনতা। হাজার বছরের বাঙালি, লাখো বছরের বাঙালি প্রথমবারের মতো পেয়েছে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু নজরুলের যথাযথ মূল্যায়ন করেনি একশ্রেণির তথাকথিত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীর দল। তাঁকে উপেক্ষা করে, এমনকি নানা অপবাদ দিয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ফেলে দিতে চেয়েছে। আর আরেক দল কাপুরুষ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকেও হত্যা করেছে। তাঁকেও নানা অপবাদে বিদ্ধ করা হয়েছে। আবার নজরুল-বিরোধীরা যেমন বাংলা শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে রাজত্ব করেছে, উভয় বাংলায় পুরস্কৃত হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরাও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছে, নানা-ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত হওয়ার অপসুযোগ লাভ করেছে। এই নিয়ে আমি (১) 'কল্পচিত্র', এবং (২) 'এই দৃশ্য আর দেখতে চাই না' শিরোনামে দুটি প্রতীকী কবিতা রচনা করেছিলাম যা একাধিক জাতীয় পত্রিকায় এবং সাহিত্য-ম্যাগাজিনে বিভিন্ন সময় ছাপা হয়েছে। কবিতা দু'টি আমার দু'টি কাব্যগ্রন্থেও ঠাঁই লাভ করেছে। যারা পড়েননি, তাদের জন্য কবিতা দু'টি এখানে তুলে দিচ্ছি।

১. কল্পচিত্র
বটের রক্ত সুন্দরীর আঁচল রাঙিয়ে
গড়িয়ে চলেছে অর্পণগাছিয়ার জলে;
সবুজের জলসাঘরে
শ্যামার আহত কণ্ঠে বেগম আখতারের ঠুংরী;
সেখানে আকবরের পোশাকে
সপারিষদ তন্দ্রাচ্ছন্ন কুড়োল।
আর ভেন্নাচারা নিয়ে বনের পথে পথে

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উচ্চকণ্ঠ
আঁরি ও করাত;
তাদের চারপাশে নেকড়ে প্রটেকশন।
(কুয়াশার বর্ণমালা / আমিনুল ইসলাম)

২. এই দৃশ্য আর দেখতে চাই না
বটের রক্তে রঞ্জিত লেকের জলে চোখ রেখে
রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কুড়াল ও করাত;
কুড়াল-করাতের শাণিত দাঁতের হাসি রৌদ্র-
কণার ঝলক মেখে বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো
ছড়িয়ে পড়ছে বৃক্ষের বাকলে। অদূরে ওসমানী
মিলনায়তনে যে আয়োজন-সেখান থেকে
ভেসে আসে লোলিত কণ্ঠের বিশেষণমাখা ঘোষণা:
'প্রাজ্ঞ উপস্থিতি, আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি-
এ বছর নিসর্গ-পদক পাচ্ছেন সবুজ ভূগোলের গর্ব–
বৃক্ষপ্রেমিক কুড়াল এবং করাত।'
–এই ঘোষণায়
ওসমানী উদ্যানের বৃক্ষের দল সালোকসংশ্লেষণ
থামিয়ে চেয়ে আছে মেঘহীন আকাশের দিকে;
ঘোষিকা বা অভ্যাগত- সেদিকে চোখ নেই কারো।
(স্বপ্নের হালখাতা / আমিনুল ইসলাম)

স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে আমি লিখেছি 'যেভাবে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ' নামের কিশোর কবিতা, যা বহুবার বহু পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওই কিশোর-কবিতার শেষের চার লাইন ছিল 'সাতই মার্চের ডাক/কোথাও নেই ফাঁক/যার হাতে যা আছে/তাই করুন তাক!' এই কবিতাটি আমার দ্বিতীয় ছড়ার বই 'ফাগুন এলো শহরে'-এ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষক কে, এই নিয়ে আমি লিখেছি 'চাঁদ-সুরুজের দেশে' নামক পরিহাসধর্মী কবিতা। কবিতাটি একাধিক সাহিত্যপত্রিকায় ছাপানোর পর আমার 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' নামক কাব্যগ্রন্থে সূচিভুক্ত হয়। ঐ কবিতায় আমি বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য হিসেবে প্রতীকায়িত করেছি। যদি কেউ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এবং বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও থাকেন, তাতে করেও বঙ্গবন্ধুর মহিমা এতটুকু ম্লান হয় না। তিনি স্বাধীনতার সূর্য; যিনি তাঁর নামে বা তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করবেন, তিনি হবেন সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদের মতো। সূর্যকে বাদ দিলে তো চাঁদের কোনো অস্তিত্বই থাকে না! কারণ তার নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোই তার আলো। ফলে স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলে আসছে, সেটা আমার কাছে মূল্যহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলেই মনে হয়েছে। আমার 'চাঁদ-সুরুজের দেশে' কবিতাটি সেই অযৌক্তিকতা ও অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে মানুষের মাতামাতিকে ভাষার চাবুকে আঘাত করে উপস্থাপন করেছে।

বঙ্গবন্ধুকে যারা জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করতে চায় না, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। জর্জ ওয়াশিংটন যদি মার্কিনিদের জাতির পিতা হন, গান্ধী যদি ভারতীয়দের জাতির পিতা হন, জিন্নাহ যদি পাকিস্তানিদের জাতির পিতা হন, তবে বঙ্গবন্ধু কেন বাঙালির জাতির পিতা হতে পারবেন না? জাতির পিতা মানে এই নয় যে, আগে ওই জাতির অস্তিত্ব ছিল না অথবা ওই জাতি জন্মগ্রহণ করেছে ওই একক ব্যক্তির ঔরস থেকে। একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যার অবদান এবং ত্যাগ অতুলনীয়ভাবে সর্বোচ্চ, তাকেই সেই জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটা কোনো জাতির মহত্তম/সফলতম ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রতীকী প্রথামাত্র। এটা সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী প্রমুখ মহান বাঙালি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অবদান নিজ নিজ মহিমায় উজ্জ্বল, যা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। কিন্তু বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতিতে উন্নীতকরণ এবং তাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়ার কৃতিত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের সমান আর কারও নয়। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্য কেউই তুলনীয় নন। তাই শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। এটা যারা স্বীকার করে না, তাদের বিষয়ে আমার কবিতা 'অকৃতজ্ঞ হাওয়া' ২০০৩ সালে লেখা, যা ২০০৪ সালে প্রকাশিত আমার 'মহানন্দা এক সোনালি নদীর নাম' কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থভুক্ত হয়।

বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। হাজার বছরের শীর্ষস্থানীয় তিনজন বাঙালির একজন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিল রয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকাণ্ডের। বঙ্গবন্ধু ঠিকই চিনেছিলেন নজরুলকে। তাঁদের দু'জনের মন-মানসিকতাও সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফেরার পরপরই তিনি কবিকে বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে জাতীয় মর্যাদায় রাখার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করেন। নজরুলও চেয়েছিলেন বাংলা বাঙালির হোক। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-ভূগোল-নির্বিশেষে মানুষের জন্য এত গভীর-নিবিড়-ব্যাপক ভালোবাসা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেনি আর কোনো কবি বা রাজনৈতিক নেতার। দেশের জন্য, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে মানুষের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার আর কে করেছেন এই উপমহাদেশে! রতনে রতন চেনে। তাই বঙ্গবন্ধু চিনেছিলেন নজরুলকে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি, নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা লেখা হয়েছে অনেক। আমি এই দুই মহান মানবকে একাকার করে লিখেছি আমার 'কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার' নামের কবিতা। এই কবিতায় বাঙালির উদ্দেশে কথা বলেছেন জাতীয় কবির মাজারের প্রতীকে জাতীয় কবি স্বয়ং। কবিতাটি প্রথমে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'বেতার বাংলা' ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। অতঃপর বহুস্থানে পুনর্মুদ্রণ। অবশেষে 'জলচিঠি নীলস্বপ্নের দুয়ার' নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ। কবিতাটি দিয়ে শেষ করছি এই লেখার।

কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার
(দোয়েল চত্বরে সুবেহ সাদেকের হাওয়া মেখে শাহবাগমুখী হেঁটে যেতে থাকা পথিককে

নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি, বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম দেখেনি, অধিকন্তু নানাভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। আর নতুন প্রজন্ম সত্য ইতিহাস না জানলে জাতির ভবিষ্যৎ পথচলা আবারও অগন্তব্যে পথ হারাতে পারে। তাই একই বিষয় নিয়ে আমি লিখেছি কিশোর কবিতা 'তর্জনী' যা দৈনিক সংবাদসহ একাধিক পত্রপত্রিকায় বহুবার ছাপা হয়েছে।

মাঝপথে ইশারায় ডাক দিয়ে কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার)
ভোরের হাওয়া অনেক খেয়েছো–এবার একটা অনুরোধ শুনে যাও–
আমি তো আপনাকে ছাড়া কাউকে কখনো কুর্নিশ করিনি; কিন্তু এই
নাও আমার মরণোত্তর সালাম– এটি পৌঁছে দিও সবুজের স্নেহমাখা
টুঙ্গিপাড়ায়– যেখানে ঘুমিয়ে আছে আমার স্বপ্নের রূপকার শেখ মুজিব;
সে-ই আমার হৃদয়ের ডাকটা ষোলআনা শুনতে পেয়েছিল; তোমরা
তাকে ভালমতো বোঝোনি– যেমন বোঝোনি আমাকে। বাংলা বাঙালির
হয়েছে– দেখে খুউব খুশি হয়েছি– যদিও বিভাজনে আমার সায় ছিল না;
কোলকাতায় ওরা কেমন আছে জানি না। তবে লালসবুজের এই
অর্জনকে ছোট করে দেখি না আমি। হে পথিক! ঘুমোত্তর হাওয়ায়
গা ভাসিয়ে চলছো তুমি পা দিয়ে স্বাধীন সড়কের বুকে। আমি ঘুমুতে
পারিনি আজো; হানাহানির শব্দে বন্ধচোখেও আমার ঘুম আসে না;
আমি তো চেয়েছি মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যাক্ বিধাতার আরশের ছাদ;
কিন্তু তোমরা এখনো ডিঙাতে পারোনি বিভেদ-বঞ্চনার বামন পাহাড়।
হে বাঙালি! বাংলা তো তোমাদের হলো; এবার গড়ে তোলো– আমি
যাকে বলেছি 'ধুলায় তাজমহল'। তাহলেই ঝটপট ঘুমিয়ে পড়বো আমি।
মানুষ তো কতকিছুই ভুলে যায়; স্মরণের ধূসর পথ বেয়ে– সেদিন
যদি ফুল দিতে আর নাও আসো,– আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক লাভ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাঙালির হাজার বছরের নিগড় ভাঙার মহানায়ক ও শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন বিশ্ব তথা এ অঞ্চলের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। শান্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে কৈশোর থেকেই তিনি সংগ্রাম-আন্দোলন শুরু করেছিলেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন– কোনোকিছুই তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা পুরো বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তিনি যে দৃষ্টিতে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর প্রভাবে বাঙালি জেগে উঠেছিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙালি ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই যুদ্ধেও বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ন্যায়ের পক্ষে ভারত-রাশিয়া আর অন্যায়ের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। ন্যায়ের বিজয় অবধারিত। ৯ মাসের যুদ্ধেই বাঙালির বিজয়। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ৯৩ হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বন্দিত্ব, ফাঁসি এবং সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসেন সগৌরবে এবং সহকর্মীদের নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। সেই সংগ্রামী কাহিনী সমগ্র বাঙালি জানে। এ প্রজন্মের কাছে ইতিহাস।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও আন্দোলন কখনোই ফুলেল ছিল না। কণ্টকাকীর্ণ ছিল আন্দোলনের সোপানগুলো। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর–এই সাড়ে তিন বছরে স্বাধীনতার শত্রুগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছু বিদেশি শক্তি এদের ইন্ধন যোগায়। এই অপশক্তি গভীর ষড়যন্ত্র করে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার, ভাগ্নে-ভগ্নিপতি, নিরাপত্তাপ্রধানকে অকাতরে হত্যা করে। আর ১৫ই আগস্টের ধারাবাহিকতায় এই খুনিদের হোতা ফারুক-রশীদ-ডালিম গং জেলখানায় ৩ নভেম্বর তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জামানকে হত্যা করে। প্রথমে মোশতাক, পরে জিয়া অবৈধভাবে বাংলাদেশের শাসক বনে যায়। তারা বাংলাদেশের খোলনলচে বদলে ফেলে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চলে মিনি পাকিস্তানি শাসন কিন্তু অন্যায় বেশিদিন টেকে না। সগৌরবে মহীয়ান এখন বাঙালির প্রিয় মানুষ শেখ মুজিব। কিন্তু এজন্যও '৭৫ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছর স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শান্তি, মানবতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সর্বহারা বাঙালির জন্য তাঁর পরিবারপরিজন, নিকটাত্মীয় এবং সহকর্মীদের আত্মত্যাগ হাজার কোটি বছর বাঙালি জাতি স্মরণ করবে। স্মরণ করবে একাত্তরের বীর সৈনিকদের।

শান্তিকামী সচেতন মানুষ জানেন, বর্তমানে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাঁরা অবদান রাখছেন, তাঁদের দু'টি সংস্থা সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে থাকে। একটি বিশ্ব শান্তি পরিষদ, অন্যটি নোবেল কমিটি। দু'টি সংস্থার প্রধান কার্যালয় ইউরোপের সুইডেন ও নরওয়েতে। নোবেল পুরস্কার শুরু ১৯০১ সালে। সে বছর প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন সুইজারল্যান্ডের জন হেনরি, ১৯৭১ সালে ব্রান্ডউইলী। বাহাত্তরে কাউকেই এই পুরস্কারটি দেয়া হয়নি। অর্থাৎ '৭১-এ বিশ্বে কোনো মানুষ শান্তি বা মানবকল্যাণে অবদান রাখেনি। আমরা তখন মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আগস্টের শেষে সর্বত্র বলাবলি হচ্ছিল বাহাত্তরে শান্তিতে নোবেল লরিয়েট হবেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু বিশ্ব শান্তির বিষয়টি বাদ রেখে সেবছর নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। গোটাবিশ্বের শান্তিকামী মানুষ তখন হতাশ হয়ে পড়েন এবং নোবেল কমিটির ওপর আশা হারিয়ে ফেলেন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই ১৯৭২ সালের অক্টোবরে চিলি'তে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শান্তিকামীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, শান্তি ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এবং ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জুলিও-কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হবে।

পরের বছর ১৯৭৩ সালের ২৩ মে ঢাকায় বিশ্বশান্তি পরিষদের আহূত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে এ পদক পরিয়ে দেন তৎকালীন মহাসচিব রমেশচন্দ্র।

আমাদের দুর্ভাগ্য– পঁচাত্তর থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর খুনি ও মদদদাতাদের ইশারায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি নিষিদ্ধ থাকলেও '৯৬ সালের পরে তাঁকে নিয়ে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। প্রচার মাধ্যমে সগৌরবে তিনি অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর জুলিও-কুরি শান্তি পদকটি লাভের বিষয়টি তেমন গুরুত্বসহকারে উপস্থাপনা হয়নি। 'জুলিও-কুরি বঙ্গবন্ধু সংসদ' ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড প্রচারণার অভাবে সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থেকে গেছে। তারা জানেন না জুলিও-কুরি কে? বিশ্বশান্তি পরিষদ কেন গঠন করা হয়েছিল? কেন এই পদকটি বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয়েছিল। পদকপ্রাপ্তির পর বঙ্গবন্ধু কী বলেছিলেন?

কুরি পরিবার গোটা বিশ্বে সুপরিচিত। বিজ্ঞানে নানা বিষয়ে এবং আবিষ্কারে এই পরিবার আটবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ম্যারিকুরি এদের মধ্যে প্রথম। এছাড়া পিয়েরে কুরি, আইরিন কুরি ও ফ্রেডারিক জুলিও-কুরি অন্যতম। ১৯৪৮ সালে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বুদ্ধিজীবী সমাবেশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ গঠনের প্রথম সভা হয় প্যারিসে। বিশ্বশান্তি পরিষদের জন্মের দিন থেকেই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির গৌরবজনক পদ অলংকৃত করেন নোবেল পাওয়া বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জুলিও-কুরি। মূলত তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ এবং মানবতাবাদের পক্ষে তাঁর প্রতিভার সমন্বয় ঘটে বিজ্ঞানের সৎ সাধনা, সংগ্রাম ও মানবতাবাদে। ১৯৫৭ সালে তিনি মারা যান। তাঁর নামেই বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৫৯ সাল থেকে জুলিও-কুরি শান্তিপদক প্রর্বতন করে। শান্তি পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ১৪০। বিশ্বের তাবৎ শান্তিকামী নেতা এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ফিদেল ক্যাস্ত্রো, আলেন্দে, গিনির ক্যাবেল, বেলজিয়ামের কানোন গোর, চেকবিজ্ঞানী অধ্যাপক লুকাস, জামাল নাসের, ভারতের পণ্ডিত নেহরু ও বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, পাবলো নেরুদা, ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, লিওনেদ ব্রেজনেভ অন্যতম।

বঙ্গবন্ধুর পদকপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বশান্তি পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজার সবুজ চত্বরে সেদিন উপস্থিত হন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি ও কূটনীতিক। পদক পরিয়ে দেয়ার সময় তৎকালীন মহাসচিব রমেশচন্দ্র বলেন: শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে। আর আমাদের প্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন– লাখো শহীদের রক্তে সিক্ত স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে প্রথম এশীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহূত শান্তি সেনানীদের জানাই স্বাগতম। উপনিবেশবাদী শাসন আর শোষণের নগ্ন হামলাকে প্রতিরোধ করে ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে শান্তি আর স্বাধীনতা একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করি, বিশ্বশান্তি তথা আঞ্চলিক শান্তির অপরিহার্যতা।

এই পটভূমিতে আপনারা– বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সহকর্মী প্রতিনিধিরা আমাকে 'জুলিও-কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করেছেন। এই সম্মান কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের 'জুলিও-কুরি' শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির। এটা আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের। বাংলাদেশের চরম দুঃসময়ে বিশ্বশান্তি পরিষদ যেমন আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, এদেশের মানুষও ঠিক একইভাবে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সাথে সহমর্মিতা জানিয়ে এসেছেন।

আমি নিজে ১৯৫২ সালে পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় শান্তি সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি ছিলাম। বিশ্বশান্তি পরিষদের ১৯৫৬ সালের স্টকহোম সম্মেলনেও আমি যোগ দিয়েছিলাম। একই সাথে এটাও আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই, বিশ্বশান্তি আমার জীবনাদর্শনের মূলনীতি। নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত, শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাঁদের সাথে আমি রয়েছি।

আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। বৃহৎ শক্তি, বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করা হোক। তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।

আমরা সর্বপ্রকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়,' শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল। তাই সামরিক জোটগুলোর বাইরে থেকে সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি। শুধু সরকারের নীতিই নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি সুদৃঢ় করা আমাদের সংবিধানের অন্যতম অনুশাসন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের সংবিধান জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারটি স্তম্ভের ওপরই রচিত। এই আদর্শের ভিত্তিতেই আমরা একটি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চাই।

আমাদের মুক্তিসংগ্রামের আলোকেই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল্য আমরা অনুধাবন করেছি। আমরা জানি, মুক্তিকামী মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম অস্ত্রের জোরে স্তব্ধ করা যায় না। সেজন্য ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাউসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতি আমরা জানিয়েছি অকুণ্ঠ সমর্থন। আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি, অন্যায়ভাবে আরব এলাকা ইসরাইল কর্তৃক জোরপূর্বক দখলে রাখার বিরুদ্ধে। আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে নিন্দা করি দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের সব স্থানের বর্ণভেদ করা নীতির। আমরা সমর্থন জানাই বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও মানবকল্যাণের যেকোনো মহৎ প্রচেষ্টাকে। বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণ আমাদের অন্যতম মূলনীতি হওয়ার জন্যই শুরু থেকে আমরা এই উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য চেষ্টা করে আসছি। পাকিস্তানের বৈরী মনোভাবের দরুন আমাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান বারবার উপমহাদেশের নতুন বাস্তবতাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এসেছে। স্থায়ী শান্তি ও মানবকল্যাণে আমাদের উদ্যোগের সর্বশেষ প্রমাণ ১৭ এপ্রিলে ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সূত্র খুঁজে বের করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে পাকিস্তান প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বেআইনিভাবে নিরপরাধ বাঙালিদের বন্দিনিবাসে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

এইভাবে পাকিস্তানের একগুঁয়ে নীতি উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আবার নতুন করে পাকিস্তানকে সজ্জিত করে চলেছেন নতুন নতুন সমরাস্ত্রে। নিঃসন্দেহে এটা স্থায়ী শান্তির যেকোনো শুভ উদ্যোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। আমি এর প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জয় বাংলা। জয় বিশ্বশান্তি।

বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টি-আকর্ষণী ভাষণ বিশ্ববাসী তথা পরাশক্তিগুলোকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এখনো বর্ণভেদ নীতি, অস্ত্র উৎপাদন এবং অস্ত্র বিক্রির জন্য কূটকৌশল অবলম্বন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি সুদূরপরাহত। বিজ্ঞানী জুলিও-কুরির স্বপ্ন আজও সফল হয়নি। নির্যাতিত-নিপীড়িত ও শোষিত হচ্ছে সংগ্রামী মানুষ। মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করছে চিহ্নিত শক্তি। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তা না হলে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট হবে।

লেখক: শিশু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

চেতনায় বঙ্গবন্ধু
একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি

অনীক মাহমুদ

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানটি যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের বাণী উচ্চকিত করেছিল বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে তা আমাদের চেতনায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে স্কুলের ছাত্র হিসেবে মিছিলে, স্লোগানে অংশ নিয়েছি আমরা। এইসব ঝাঁঝালো দিনগুলোর উদ্‌বেলন মনের ভেতরে স্থায়ী রেখাপাত ঘটিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নামে আমাদের স্লোগান ছিল:

১. শেখ শেখ শেখ মুজিব
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।
২. তোমার নেতা আমার নেতা,
শেখ মুজিব শেখ মুজিব।
৩. জেলের তালা ভেঙেছি
শেখ মুজিবকে এনেছি।
৪. তোমার আমার ঠিকানা,
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
৫. তুমি কে আমি কে
বাঙালি বাঙালি।

মোস্তফা নামে এক মাদ্রাসার ছাত্র যেভাবে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের হাটে-বাজারে রাজপথে নামিয়েছিল তা ছিল একেবারে অভূতপূর্ব। এরপর শুরু হলো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেম্বরদের রিজাইন নেয়ার পালা। এ পর্বে ছাত্রনেতারা চেয়ারম্যান-মেম্বরদের বাড়িতে গিয়ে ইস্তাফাপত্র নেয়ার সময়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল সেখান থেকে আন্দোলনের তীব্রতর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের গ্রামের হাইস্কুলের ছাত্ররা স্কুল থেকে মাইল তিনেক দূরে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাড়িতে গিয়েছিল রিজাইন লেটার নিয়ে আসতে। এটা ছিল সে সময়ের নন কো-অপারেশন কর্মসূচির একটি অংশ। শোনা গেল, বাড়ির ভেতরে থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বন্দুকের গুলি করা হয়েছে। এক ছাত্র এসে খবর দিলো গুলিতে কয়েকজন মারা গেছে। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। স্কুলের উন্নয়নকল্পে আয়োজিত ধর্মসভার পূর্ণ অধিবেশন চলছে। এই খবরে সভা পণ্ড হয়ে গেল। দলে দলে লোকজন ছুটল চেয়ারম্যানের বাড়ির অভিমুখে। বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দিলো চেয়ারম্যানের বাড়িসহ পাড়াটি। আমাদের মহল্লার পাশের রাস্তা দিয়ে জনস্রোত গিয়েছিল সন্ধ্যার সময়। আমার ভাইয়েরা স্কুলের ওপর শ্রেণির ছাত্র। তারাও সে জনস্রোতে শামিল হয়েছিল। এরপর পালিয়ে থাকা। গণ গ্রেফতার। মামলার বিপরীতে হামলা। পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নেয়া। আসামির সঙ্গে পুলিশের রাইফেল ছিনতাই ও সংঘর্ষে পুলিশ মার্ডার। গ্রামে ইপিআরের অপারেশন। এরূপ ডামাডোলের মধ্যে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এক আওয়ামী লীগ নেতা মাকে বুঝিয়ে বাড়িতে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রেখে গেল। সেজো ভাইয়ের ঘরে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা। দিনের বেলায় ঘরের দুয়ারে খড়ির পালা। রাত্রে সেটা সরিয়ে ফেলা হতো। টিনের চালা থেকে চুনপড়া কুমড়া নামিয়ে বাড়িতে রক্ষিত কুয়াসেচা কই মাছ দিয়ে রান্না করা ভাত-তরকারি মায়ের ঘর থেকে ভাইয়ের ঘরে পৌঁছানো হতো। কখনো কখনো এর মাঝে যুক্ত হতাম আমি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুরুর পর থেকে সকালবেলার অধিবেশন শোনা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকেই 'শোন একটি মুজিবরের থেকে, 'জয় বাংলা বাংলার জয়,' 'আমার সোনার বাংলা' গানগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন মাঝরাতে সেজো ভাইয়ের ঘরে হইচই লক্ষ করলাম। কমান্ডার পরেশ মাস্টার হাউমাউ করে কাঁদছেন। অন্যেরা তাঁকে বোঝাচ্ছেন। তাঁর সামনে স্টেনগান। ঘরে আমার মামা আওয়ামী লীগ নেতা রয়েছেন। পরেশ মাস্টার শুনতে পেয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি মাঝরাতেই রাস্তায় নামবেন। ব্রাশ ফায়ার করবেন। শেষে কান্না আর প্রবোধের মধ্যদিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত হলো। ভালো করে খোঁজ-খবর নেয়ার অঙ্গীকারও করা হলো। না পশ্চিম পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে মারার সাহস দেখায়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়মিত সম্প্রচারিত হতে থাকল। আমার কিশোর মনে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ একটি স্বতোৎসারিত মোহাবিষ্টতায় এরই মধ্যে আমূলিত হয়ে গেছে।

স্বাধীন সার্বভৌম স্বভূমি মানুষের জন্য এক পরম প্রাপ্তি। যুগ-যুগান্তর ধরে বাঙালি জাতি নিজ বাসভূমে পরবাসী ছিল। এদেশেই এ জাতির ওপরে শক-হূন-সেন-মোগল-পাঠান-ইংরেজ-পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। দেশ শাসনের নামে অকাতরে ছড়িয়ে দিয়েছে বর্বরতা। কবির সান্ত্বনা ছিল:

যে জন পরাধীন সে যে অবশ্য দীন
সুখ-দুঃখ নাহিক বিশেষ।

পরাধীন গরিব জাতির জন্য অত্যাচার নিগ্রহ নিয়তি। আমাদের জাতির জনক এই নিগড় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪১ সালে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসবের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: 'বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলেম...। হিন্দু মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।'

জাতির জনক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বক্তৃতায় সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' পরার্থ প্রেমের এ এক মহান উচ্চারণ। ৫৫ বছরের জীবনে যিনি ১৪ বছরই কারাগারের অন্তরালে কাটিয়েছেন শুধু মানুষের মুক্তি আর অধিকারের জন্য বিদ্রোহ করে। জগতে এমন মানুষ বিরল। ফলে আমাদের চোখে যেসব ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে তেজস্বিতায়, ব্যক্তিত্ব, শৌর্যবীর্যে বঙ্গবন্ধু অনন্য। ক্ষত্রিয়রা সাধারণত শক্তি প্রয়োগে কিংবা ছলে বলে কৌশলে শীর্ষস্থান দখল করতে চায়। বঙ্গবন্ধু কখনো কি কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন? রাজপথ ছেড়ে কখনো কি তিনি কানাগলিতে অবস্থান নিতে গিয়েছেন? এ কারণে বঙ্গবন্ধুর ডাকে উৎসর্গ করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের জীবন বাংলার স্বাধীনতার জন্য।

বঙ্গবন্ধু আমার-আমাদের চেতনার সঙ্গী হয়ে উঠেছেন কিশোর কাল থেকেই। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাঠে নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় আমার আগ্রহ কখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। তবে মহান নেতার চারিত্র্য–বঙ্গবন্ধুর মধ্যেই আমি ত্যাগ ও পরার্থ চিন্তার অনুকূলে দেখেছিলাম। এ কারণে বঙ্গবন্ধু বারবার আমার কবিতা ও গানে নানা মাত্রিকতায় নানা আভরণে উপজীব্য হতে পেরেছেন। কিশোর কবিতার ভুবনে 'জন্মভূমি জননী তুমি' গ্রন্থের 'জাতির পিতা', 'এইসব ভয়াবহ আরতি' কাব্যের 'জনকের ছায়া', 'পিতৃঋণ', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব', 'চৈতিচাঁদে রাহুর লেহন' গ্রন্থের 'আরও একটি বিষাদসিন্ধু', 'ভদ্রলোক সংহিতা' কাব্যের 'আগস্টের অসমাপ্ত কবিতা', 'কালিন্দী আকাশ কংসগহ্বর' কাব্যের 'আগস্ট হাসে আগস্ট কাঁদে', 'তখনো বৃষ্টি ঝরছিল' গীতগ্রন্থের ২৮ নং গান থেকে ৫১ নং বাঙালির বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত ২৪ টি গান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখিত হয়েছে। 'নৈঃশব্দ্যের শব্দারতি' কাব্যের 'মৃত্যুঞ্জয় জাতির পিতা', 'পনের ও একুশে আগস্ট', '১৫ই আগস্ট এখনো' প্রভৃতি কবিতাবলি বঙ্গবন্ধুর কৃতী ও কৃতিত্বগাঁথা নিয়ে পুষ্পিত হয়েছে। কখনো ভাবের আতিশায়ন কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য ধারাপটে বঙ্গবন্ধুর মহিমা বিমর্ষ হয়ে ওঠেনি। 'চিরায়ত বাংলা: ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু', 'বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্জিত বিজয়' দুটো প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর কৃতী ও কৃতিত্বের কথা বলেছি। এই লেখাগুলো পরিকল্পিত গবেষণার ফসল নয়। বাস্তবের আবেগ এবং তাৎক্ষণিক তাড়না লেখাগুলোর পরতে পরতে পাওয়া যাবে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রস্রবণ এগুলোর সঙ্গে মিশে আছে। আজকেও ১০ই জানুয়ারি, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ১৫ই আগস্ট প্রভৃতি সময়ে বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক প্রতিকৃতি আমাদের অনুভূতির বাগানে চাষ করে শব্দের বীজ। শব্দব্রহ্মের অপার আকিঞ্চন আমাদের আবেগের পরতে পরতে তাঁর অসামান্য দানের মহিমাকে সর্বদা জাগ্রত করে। ২০১৭ সালের প্রথমদিকে টুঙ্গিপাড়া গিয়ে আবেগদীপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। মাজারের খাদেমের মোনাজাত পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে কীভাবে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম অনেকটা আবেগ বিহ্বলতায় তা ছিল অজানিত স্বতঃস্ফূর্ততার এক উদ্ভাসন। হয়তো তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আমার জন্মদাতা পিতা খন্দকার মজিবর রহমান। এইসব স্বর্গীয় মানবের হাতছানি কল্যাণ আর সত্যব্রতে মনের অজান্তেই মহিমার শেকড় ধরে ক্রমাবধি চেতনার গাছটিকে নাড়িয়ে যায়। আর মনে হয়, এই অবিনাশী চেতনার বৃক্ষটি উৎপাটিত করার মতো কাউকে দেখিনি। বোধিবৃক্ষের মতো আমাদের জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধু মহাজ্ঞানযোগ স্থাপন করে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সদা রয়েছেন বদ্ধপরিকর। আমরা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে অনাগত ভবিষ্যতের পথনির্মাণে প্রয়োগ করব। এই চেতনার উদ্‌বেলনে গড়ে তুলব বাংলা ও বাঙালিত্বের সুদৃঢ় বুনিয়াদ। জয়তু বঙ্গবন্ধু।

লেখক: কবি, প্রবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক এবং অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাবেক ডীন, কলা অনুষদ, রা. বি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পিএম শফিকুল ইসলাম

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই পঞ্চম বাহিনী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচয় নিয়ে কুৎসা রটনা করা হয়। তাঁকে নতুন করে ভারতের দালাল প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। পঁচাত্তরের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর সামরিক শাসনের সময়ে এবং পরবর্তীকালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধুকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর বিকল্প নেতা হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাসিত করে জেনারেল জিয়া সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে ছাপানো হয়েছে। জেনারেল জিয়াকে স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। রেডিও-টেলিভিশন থেকে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাসিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়েছে ইসলাম ধর্মের শত্রু হিসেবে। অথচ তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসন-আমলে পূর্ববাংলায় যা হয়নি, বঙ্গবন্ধু তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের জন্য তার চেয়ে বেশি কাজ

করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাবলিগ জামাতের জন্য কাকরাইলে জমি বরাদ্দ করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। সোনারগাঁ-শেরাটন হোটেলসহ মদ জুয়া বন্ধ করেন। তারপরও জেনারেল জিয়ার দলসহ একাত্তরের পরাজিত জামায়াত-শিবিরচক্র অপপ্রচারে লিপ্ত হয়।

১৯৭৫-এ পটপরিবর্তনের পর বা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। এরপর ক্রমাগত মূল সত্যগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে। ২০০১-এ জেনারেল জিয়ার বিএনপি আবারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। এ সময়ের B.B.C রেডিও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনমত জরিপ করে। এর ফলাফলে দেখ যায়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু এক শতাব্দীর জন্য নয়, হাজার বছরের বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন। এরপরেই আছেন বিশ্বনন্দিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে আছেন অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রূপসীবাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, বেগম রোকেয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন মনীষীর অবদানে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এদের সবাইকে পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গেলেন, শুধু তারাই নন– এর পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মাস্টারদা সূর্যসেন, ঈশা খাঁ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জ্যোতিবসু প্রভৃতি রাজনীতিবিদকে পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বাংলার খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিকরা যার যার ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, বাংলার সংস্কৃতি তাদের সেবায় ধন্য হয়েছে। বাংলার রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের শেষদিক থেকে রাজনীতির মঞ্চে আসেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন; কিন্তু তাঁর কাজ অসমাপ্ত থেকে গেছে। ব্যর্থ হয়েছে অনেক বিপ্লব বীর বিপ্লব। শের-ই-বাংলা এদেশের মানুষের কাছে খুবই শ্রদ্ধাভাজন একজন রাজনীতিবিদ। মওলানা ভাসানীও তাই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানি শাসকদের রোষানলে পড়ে জেল খেটেছেন, বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, নজরুল একটু একটু করে বাঙালি জাতিকে সভ্য করে তুলেছেন, এদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদরা জাতিকে তিলে তিলে শিক্ষিত করেছেন, এদেশের রাজনীতিবিদরা জাতির স্বার্থে সংগ্রাম করেছেন, আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের সম্মিলিত প্রয়াসকে সফল করেছেন। অর্থাৎ সব মনীষীর যে ভাবনা, তার সফল রূপায়ণ ঘটেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। তাঁর হাতেই প্রথম বাঙালি জাতি পেয়েছে একটি মানচিত্র, একটি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও একটি সংবিধান। তাঁর নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হয়েছে, এ কারণে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি আমাদের জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও সভাপতি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, রা. বি.

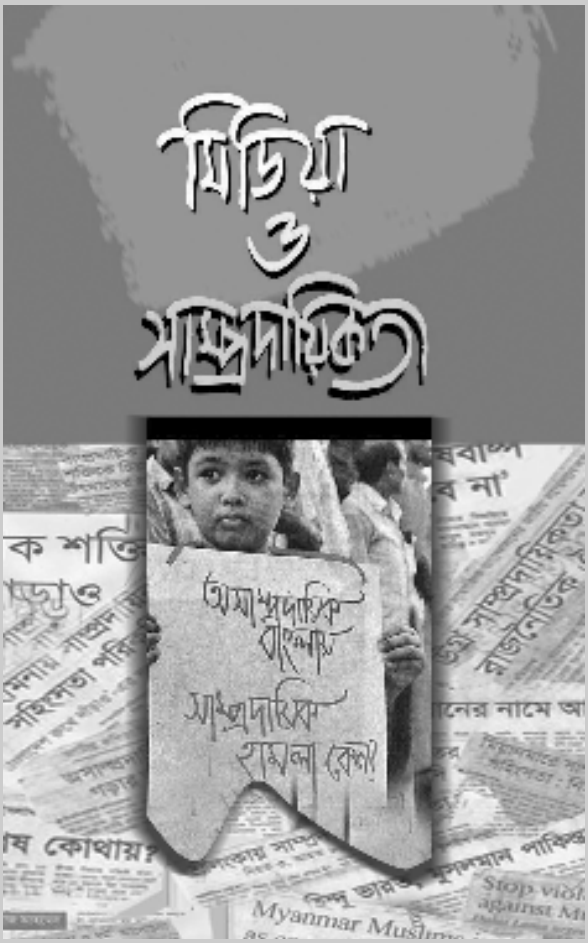

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

৩ সার্কিট হাউস রোড

ঢাকা-১০০০

বঙ্গবন্ধুই বাঙালির রক্ষাকবজ

শহীদ ইকবাল

অতি ছোট্ট বোকা ভাবনায় বাংলাদেশ ও মুজিবকে সমার্থক বলে ভাবলে কেউ কি এখনো বলবেন যে, ওটা ভুল! পদ্মা-মেঘনার স্রোত আটকালে, পাখির গান থেমে গেলে, শ্রাবণের বৃষ্টি না নামলে, শিশুর হাসি বন্ধ হলে কেউ কি বলবে ১৫ই আগস্ট এদেশে কিছু হয়নি! এখন তো অনেক মানুষ এদেশে, এখন ৩২ নম্বরে ট্যাঙ্ক নামলে কী হতো? মুজিব-রাসেল-কামাল-জামালরা নেই, ৩২ নম্বরে এখন শোক– তাতে কবিতার কণ্ঠ কি থেমে আছে! ৩২ নম্বরের সিঁড়িতে পিতা নেই, তিনি বিদেহী আত্মাকে হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন, বুটের কালো আঘাতে রক্ত গড়ানো সিঁড়ি আরও রক্তাক্ত, না মোছা রক্তের দাগ, আরব্য রজনীর পরাস্ত সুগন্ধীর পরাজিত কর্কশ ঘ্রাণ– সবটুকু লুটায় এই সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে। বইছে তা, লাল লালিমার অস্তরাগের আভায়, ওঠে নামে; ডোবে না, শুধু তাকায় ত্রস্ত ভঙ্গিতে, বাংলাদেশ তখন আর স্বভাবে থাকে না, পরাভূতরা নিজেদের তত্ত্ব দেয়, কী কী সব বানায়– মুসলমান বানায়, ইসলামী হয়, ইসলামকে সামনে রেখে স্বার্থের পক্ষ বিস্তার করে। তাতে বিকৃতি

লেপটে থাকে, ধুয়ে-মুছে যায় মুখশ্রীর আভা, ক্ষত বাড়ে, দেশ পেছায়, জাতি বিনষ্টির দিকে এগোয়, রক্তাক্ত হয় পতাকা, দুলে ওঠে অশনিবাতাস। শোনা যায়, ৩২ নম্বরটা শূন্য। ওখানে আর সভা হবে না, বাণী আসে না, স্তাবকরা যাবে না, হল্লাও হয় না। গুলজার হয় না সেই ঐতিহাসিক উদ্বেলিত হাসি। আশ্চর্য, সবটাই কি বিনাশ! গন্তব্য তবে কি টুঙ্গিপাড়া! কেন এই মূর্তিতে শাপ, অভিশাপগ্রস্ততা?

২. ব্যক্তি-বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের চেয়ে বড়। স্বীকার করি, তিনি রাষ্ট্রদ্রষ্টাও। জনকই তো! ব্যক্তি বলেই তো জনক। ব্যক্তির সৌন্দর্যই তাতে অবমুক্ত। ব্যক্তিটি কে? আত্মা। আত্মাই প্রতিভা ও সাধনায় প্রতিষ্ঠা দেয়। সুমানসিকতাও গড়ে তোলে। প্রতীকে পরিণত করে। মন তাতে রাঙায়। অন্যকেও। সূর্যের আভা বিকিরিত হয়। বিন্যস্ততা পায়। তাই রাষ্ট্রে ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্যক্তিই যখন তার কর্মগুণে রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায়। ব্যক্তির পেছনেই তো সমর্থন তৈরি হয়। একত্রিত করে মানুষকে। পেছনে আবেগ জড়ো হয়। সমান করার চেষ্টা করে। ন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলে। ন্যায়বিচারের প্রশ্নে শক্ত হয়। বলতে থাকে, গণতন্ত্র দরকার। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সৃজন করা প্রয়োজন। এই যে প্রয়োজন, তা কীসের জন্য? সকলের সুবন্দোবস্ত হলেই সবাই ভালো থাকবে– তা-ই। আর তাতেই তো মানবের সৌন্দর্য। সভ্যতার উৎকর্ষ। এজন্য প্রয়োজনের ভেতর দিয়ে অপ্রয়োজনও খুঁজতে হয়। সেটিও দরকার। তাই তো পদ্ধতির মধ্যেও অপ্রয়োজনের ব্যাপ্তির কথাও বলে দেওয়া হয়। যেমন, যদি ধরি সমাজতন্ত্রের কথা– সেখানে তো শুধু ক্ষুৎপিপাসার কথা হয়নি। ক্ষুৎকাতরতার সমাধান হলে মানুষ অপ্রয়োজনের জগতে চলতে পারে। তাতে সমাজে সৌন্দর্য বাড়ে, হানাহানি থাকে না। সৌভ্রাতৃত্বও তৈরি হয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য ও আনন্দের জগতে তো ব্যক্তিই বড়। যেমন বড় ছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। সেই দূরের পল্লী থেকে কাছে এসেছিলেন। খুব কাছে। বড়, উদার, আকাশপ্রতিম সৌন্দর্যে গুলজার করা শ্বাস নিয়ে হাজির হন, মানুষের সম্মুখে। আপসহীনতাটাও ওই উদারতার ভেতরেই। দাঁড়ান নিজের পায়ে, স্বীয় চেতনায়। রাষ্ট্রপূজা তাঁর মুখ্য নয়। ব্যক্তি সৌন্দর্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিকভাবে সকলের ন্যায় সত্যটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপস ছিল না। তাইতো তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে এতদূর ক্রন্দনরোল, আজও অনেকের মনে– এটা ক্ষতির ভয়ে যতটা তার চেয়ে আবেগের বেগের আকর্ষণ এত বেশি।

৩. তাঁর আদর্শ এখনও দরকার। বুঝি সর্বদাই তার প্রয়োজন হবে। কারণ, ওই ব্যক্তিসত্তা। তার অমিত তেজ। অনলবর্ষী বার্তাসকল। নেতার ইতিহাসেই তো তিনি নেতা। নেতাই আবার ইতিহাস। ইতিহাসের জমিনে তিনি নেতা। তাঁর সঙ্গে মেলে অনেকটা যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর। কীভাবে যেন সকলকে সবকিছুর উর্ধ্বে এক করে ফেলেন তিনি। একবিন্দুতে মেলান। সেখানে পরাজিত যারা, কুণ্ঠা আছে যাদের তারাই ভয় পান। পেয়েছেনও। সেই ভয়েই তো পিছিয়ে যাচ্ছিলেন, মৃত্যু ঘটানোর সময় পর্যন্তও। প্লানটাও সেমাফিক ছিল, মারাটা কঠিন হবে, তবে না মারলে বা প্রভুদের কথা না শুনলে তো কুলাঙাররা হেরে যাব, বিসর্জন দিতে হবে সবকিছু। ক্ষমতাটুকুও। আর অন্য লোভ তো বটেই, এক অর্থে সবটুকুই। তাই ঘটিয়ে ফেলা হলো। তারপর তো ওই নৃশংসতার পথ বেয়েই রাষ্ট্রের পেছনে চলা। কিন্তু বিপরীতে ব্যক্তি ক্রমশ মহান হয়ে উঠল। মহোত্তর মহান। ওই ব্যক্তির গুণে। রাষ্ট্র এখনও আছে, হয়তো তা একপ্রকার সমাজের দেহ বহন করে আসছে। কিন্তু ব্যক্তি মুজিব, বঙ্গবন্ধু তো অনেক বড়; যেমনটা তিনি তার চাইতে আরও বড়, অনেক গুণ। পৃথিবীর মানুষ ন্যায়বিচারের শর্তেই তা জানে। স্মরণ করি তাঁকে– শ্রদ্ধাভরে।

লেখক: অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

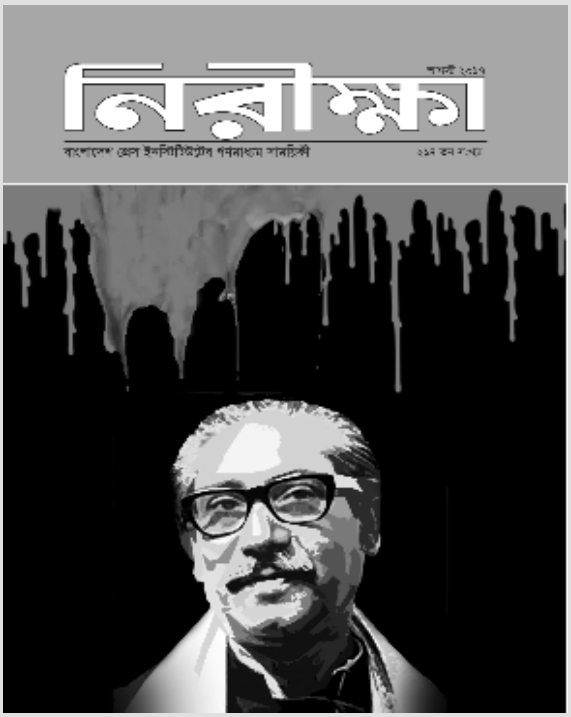

গণমাধ্যম বিষয়ক আপনার লেখাটি নিরীক্ষার পাতায় মুদ্রণ করতে চাই। এর জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখাটি নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

দিল মনোয়ারা মনু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাত্রে ইতিহাসের এক জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই কলঙ্কময় রাতকে আমরা কখনো ভুলতে পারব না; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই একটি জাতি ও তার স্বাধীনতার। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত এ বদ্বীপ বাংলাদেশের সংগ্রামী চেতনার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ ৩৫ বছর জেলজুলুম, অত্যাচার, সব ধরনের হুমকি ও রক্তচক্ষু অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু গড়ে তুলেছিলেন বাঙালির অধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাঝে নিহিত বাঙালির জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছিল। এর বিকাশ ঘটে ঐতিহাসিক ছয়-দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ৬-দফা ও ১১-দফার দাবিতে সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ ও ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, সামরিক একগুঁয়েমি এবং

দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন– যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপান্তর ঘটে।

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংবিধান রচনা এবং তার মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে। অবিভক্ত পাকিস্তানে জাতীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এটাই প্রথম এবং শেষ নির্বাচন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় হতচকিত সামরিক জান্তা তাদের জাতীয় পরিষদে বসতে দিল না। সাথে সাথে জনগণের ওপর সামরিক উৎপীড়ন বেড়ে চলল। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আহ্বান স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে সমগ্র জাতি সংকল্পবদ্ধ হয়। চতুর সামরিক জান্তা যথানিয়মে চাতুরীর আশ্রয় নিল। একদিকে লোক দেখানো আলোচনা, অপরদিকে বাঙালি নিধন ও গণহত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করা। এমনি করে এ দেশের জনগণের ওপর হানাদার বাহিনী একটা বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করা হলো। ওরা ভাবল, বঙ্গবন্ধুকে কারাবন্দি করলে বাঙালি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে। তারপর হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের এই প্রাণের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া যাবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো।

২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী তৈরি করা হয় ১০ই এপ্রিলের ঘোষণাপত্র। আর তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নির্দেশকে সামনে রেখে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা করা হলো। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হলো কুষ্টিয়া মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে। সেই থেকে এই বৈদ্যনাথতলা ইতিহাসে মুজিবনগর নামে খ্যাত।

বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে আটক রেখেও যখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারল না, তখন জেলের মধ্যেই শুরু হলো বিচার নামের নিন্দনীয় প্রহসন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলো। মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা চেয়ে চাপ সৃষ্টি করা হলো ইয়াহিয়া সরকারের ওপর। এই বিশ্বচাপের ফলে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রস্তুতি স্থগিত রাখা হলো। ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য যখন নিশ্চিত হয়ে উঠল, তখন শুরু হলো নতুন অপকৌশল আর ষড়যন্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের নামে গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটানো পাকিস্তানি সামরিক কৌশলের ছিল আরেকটি নিন্দনীয় দিক। এমন একটি অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই এই নতুন জঘন্য ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হলো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ দেশকে সর্বব্যাপী নেতৃত্বহীন, আদর্শচ্যুত ও বিভ্রান্ত করা ছিল এই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন সুনিশ্চিত তখন বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে এ দেশকে করতে চেয়েছিল পঙ্গু ও নেতৃত্বহীন। অধ্যাপক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এক দীর্ঘ হত্যা তালিকায়। বুদ্ধিজীবীদের এই হত্যাকাণ্ড হিটলারের ইহুদি নিধন ও গ্যাস চেম্বারে গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঢাকার মোহাম্মদপুর-মিরপুরসহ প্রতিটি শহরে তৈরি হয়েছিল একেকটি বধ্যভূমি।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা, সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা, জাতীয় চার নেতাকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে হত্যা এ দেশকে নেতৃত্বহীন করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে।

এসব হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক জঘন্য কলঙ্কময় অধ্যায়। আরও কলঙ্কময় যে এসব হত্যাকাণ্ডের যাতে বিচার না হতে পারে, আইনকে অবরোধ করার জন্য তৈরি হলো ইনডেমনিটি অর্থাৎ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ-'৭৫।

জাতিসত্তার গোঁড়ার কথা হলো জাতিগতভাবে মৌলিক মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং অবিচলভাবে নিষ্ঠার সাথে সে মূল্যবোধের সৃষ্টি ও লালন। এমনি মৌলিক মূল্যবোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র, সংবিধান, বিচার, আদালত, সংসদ, রাজনীতি– এককথায় সামগ্রিক জাতীয় পরিচিতি। কিন্তু জাতিসত্তার উষালগ্নেই আমাদের মৌলিক এই আত্মচেতনাবোধে হানা হয়েছে চরম আঘাত। এই আঘাত থেকে মুক্তিলাভ তো দূরের কথা, জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচার পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। এখনো ঘাতকদের অনেকে বিদেশে আত্মগোপন করে আছে।

চরম আত্মত্যাগ ও গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাহসী সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রাণ দিয়েছে, জানমাল তুচ্ছ করে জীবনকে বাজি রেখে যারা স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল, তাদের চরম ত্যাগ কি ব্যর্থ হবে ইতিহাসের চরম এই বিশ্বাসঘাতকতায়। কোনো দিনও নয়, আজ তাই নতুন প্রজন্মের ও দেশবাসীর চোখে নতুন প্রত্যাশা, নতুন স্বপ্ন, রাষ্ট্র ও বিচারকদের কাছে, সংবিধান ও আইনের কাছে এবং রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিটি শিক্ষিত বিবেকবান মানুষের কাছে। এই প্রত্যাশা পূরণের সহযোগিতার আহ্বান তাদের।

চরম আত্মত্যাগ ও গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাহসী সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রাণ দিয়েছে, জানমাল তুচ্ছ করে জীবনকে বাজি রেখে যারা স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল, তাদের চরম ত্যাগ কি ব্যর্থ হবে ইতিহাসের চরম এই বিশ্বাসঘাতকতায়। কোনো দিনও নয়, আজ তাই নতুন প্রজন্মের ও দেশবাসীর চোখে নতুন প্রত্যাশা, নতুন স্বপ্ন, রাষ্ট্র ও বিচারকদের কাছে, সংবিধান ও আইনের কাছে এবং রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিটি শিক্ষিত বিবেকবান মানুষের কাছে। এই প্রত্যাশা পূরণের সহযোগিতার আহ্বান তাদের

আমাদের সংবিধানে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সব নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সব নাগরিকের জন্যই সমভাবে তা প্রযোজ্য। যিনি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যাঁর নামের সাথে বাংলার স্বাধীনতা আর এ দেশের উন্নতি প্রগতি একাত্ম হয়ে মিশে আছে। জীবনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, নিজের জীবন-যৌবন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে যিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, যিনি এদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে বলেছিলেন, 'কবিগুরু তোমার বাঙালি দেখ আজ মানুষ হয়েছে' বাঙালিদের স্বাধীন মানুষের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা লাভের গর্বে গর্বিত। সে বঙ্গবন্ধু ঘাতকের গুলিতে যখন গড়িয়ে পড়ছিলেন তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে তখন মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে সারা জাতিই গড়িয়ে পড়ছিল।

বহু মৃত্যু, হত্যার পর বঙ্গবন্ধু এদেশের আর রক্ত দেখতে চাননি। মৃত্যু চাননি। তিনি দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। দেশবাসীর জন্য হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান চেয়েছিলেন। শান্তি আর সমৃদ্ধি কামনা করতেন প্রতি মুহূর্ত। আর সেই সুযোগে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এ দেশের স্বাধীনতার চেতনা, লক্ষ্য, ইতিহাস– সবকিছু বিকৃত ও বিপথে চালিত করার কাজে লিপ্ত হয়েছিল।

এদেশে আমরা দেখেছি ঘাতকের আঘাতে জাতির পিতাকে হত্যার ফলে মৌলিক মূল্যবোধ ও আদর্শের চরম অবক্ষয়। স্বাধীনতার চেতনা ও ইতিহাসকে করা হলো বিকৃত। কী দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। আর এই পতনের ওপর রচিত হলো একটার পর একটা হত্যা, ষড়যন্ত্র এবং একটি রক্তাক্ত ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যার মাধ্যমে এবং সেই হত্যার বিচার রোধের নানা অপচেষ্টা করে জাতির আত্মপরিচয়ের ইতিহাসে যে গ্লানি ও কলঙ্ক সৃষ্টি করা হলো, তা সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কারবালার হত্যাকাণ্ড স্মরণ করে যেমন মানুষ আজও কাঁদে, তেমনি বাঙালিদের চোখে যদি অশ্রু অবশিষ্ট থাকে তবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কথা স্মরণ করে আজও বাঙালি কাঁদবে। বাঙালি তার শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে কাঁদবে। সেই কান্নায় যেন এই পাপ ক্ষয় হয়।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের

শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শেখ মুজিব ও আজকের বাংলাদেশ

জয়শ্রী জামান

শেখ মুজিব মানে রাজনীতির মহাকবি, যিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। হাজার বছরের বাঙালির দু'শ' বছরের স্বাধীনতার বাস্তব রূপকার, শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির চিরচেনা মুজিব, শেখ সাহেব অথবা জনক। যিনি বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে জেল, জুলুম, অত্যাচার এমনকি মৃত্যুর কাছেও মাথা নত করেননি। লেখক হুমায়ুন আজাদ বলেন,'জনগণকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া যায়, হিটলার মুসোলিনির মতো একনায়কেরাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিল, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তারা জনগণকে উন্মাদ আর মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিল। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিল শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ আগ্নেয়গিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি জাতিকে, যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।' বঙ্গবন্ধুর সেই শুভ দাবানল রচিত হয়েছিল যে দর্শন নিয়ে তা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার মহাদর্শে মহীয়ান।

তিনি বলেছিলেন, 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন

করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি।' তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' 'আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।'

তাই বলাই বাহুল্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ভাবধারা ছিল, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা– 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।' অথচ সেই চেতনা আজ জঙ্গিবাদ নামক কালো থাবার মুখোমুখি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের যে মূল চেতনা তা নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা, যা ধারণ করে রচিত হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তারই সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আপোসহীন নেতৃত্বের আলোচনার আগে জাতীয়তাবাদ বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করছি।

জাতীয়তাবাদ অভিধাটি আধুনিককালের। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান রূপকার ছিলেন ইতালির নিকোলাই ম্যাকিয়াভ্যালি। কেউ কেউ মনে করেন, জাতীয়তাবাদের সূচনা মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাঙালির জাতীয়তাবাদ গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বর্ণনা দেন,"জাতীয়তাবাদ আসলে একটা অনুভূতি। তাতে দেশপ্রেম থাকে, কিন্তু দেশপ্রেম থেকে আবার তা স্বতন্ত্রও বটে। ব্যাপকও, কেননা, দেশপ্রেমের তুলনায় জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি রাজনৈতিক। দ্বিতীয়ত, একটি জাতি কেবল একটি দেশে নয়, বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে পারে, করেও। বাঙালিরা আজ যেমন করছে, কিন্তু জাতীয়তাবাদ ভিন্ন অর্থে দেশের কথা ভাবতেও পারে, আবার না ভেবেও পারে। দেশ কল্পনায় স্মৃতি থাকে অতীতের, স্বপ্ন থাকে ভবিষ্যতের, স্বপ্ন ও স্মৃতি মিশে একাকার হয়ে যায়, এই স্বপ্নটা খুবই জরুরি, কেননা সমষ্টির মত ও স্বপ্ন ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে না। এমনকি টিকে থাকাও কঠিন।"

প্রাচীন যুগ বা মধ্য যুগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। প্রাচীন বাঙলা নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা 'হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালি' কথাটা উচ্চারণ করি এবং এ নিয়ে গৌরব বোধ করি। যুগ যুগ ধরে এসব জনপদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত একটা ঐক্যসূত্র ছিল। সেই ঐক্যবোধ আজো আমরা লালন করে আসছি আমাদের চৈতন্যের গভীরে। ইংরেজি শিক্ষা, দর্শন, চিন্তাধারার প্রভাবে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। মধ্যযুগে সুলতান ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সুলতানি আমলের দু'শ' বছরের (১১৩৮-১৩৫৮) অস্তিত্ব আমাদের জাতিসত্তা গঠনে অবদান রেখেছে। যে ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করে আমরা আজকের জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হয়েছি, তার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দু'শ' বছরকে (১১৩৮-১৩৫৮) স্বর্ণযুগ বলা হয়।

মোঘল আমলে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্রগতভাবে যে ঐক্যের বীজ সুলতানি আমলে রোপিত হয় তা বিকশিত হয় মোঘল আমলেই। এই আমলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ একটি শাসনতান্ত্রিক একক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, যাকে 'সুবে বাঙলা' বলে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া বাঙালির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইতিহাস খ্যাত বারো ভূঁইয়ার প্রতিরোধের মধ্যে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রতিফলন ঘটেছিল তাতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের আন্তরিক স্ফুরণ না থাকলেও তা ছিল জাতীয় ঐক্য চেতনার কাছাকাছি।

এই বাঙালি ঐক্যচেতনা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা সম্পর্কিত আমাদের আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শের প্রভাবে যে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আমরা ব্রিটিশ বঙ্গে দেখতে পাই, তা বাঙালি জাতীয় চেতনায় আবদ্ধ থাকেনি। গণ্ডি পেরিয়ে তা ভারতীয় জাতীয় চেতনার রূপ পরিগ্রহ করে। এই চেতনা প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে বিকশিত হয়, যার প্রধান আশ্রয় সর্বভারতীয় ভাবধারা। এদেশের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণা তাদের চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জাতীয়তাবাদের যে প্রবল আন্দোলন দানা বেধে উঠেছিল তা সম্পূর্ণভাবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী উত্থান বা আন্দোলন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বাঙালি জাতীয়তাবাদসূচক গান ও কবিতা এই আন্দোলনে গভীর প্রেরণা যোগায়।

রবীন্দ্রনাথের সেই গান ও কবিতার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো,

(১) "বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক
হে ভগবান।"

(২) "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।"

(৩) "সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।"

রবীন্দ্রনাথের এই সকল গান ও কবিতা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে গভীর প্রেরণা যোগায়।

আমেরিকার প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক এজরা পাউন্ড বলেন, "রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে বাংলাকে এক জাতিতে পরিণত করেছেন। কিন্তু. অন্যদিকে এই আন্দোলনে বাংলার মুসলমান জনসাধারণ কেন যোগ দেয়নি তা তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।"

মানবতাবাদী সত্যান্বেষী রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের একটি সত্যের উপলব্ধি হলো এই– "বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের শাস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।" রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। উপমহাদেশের রাজনীতির বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজ ১৯০৫ সালের পূর্বে কোনোদিনই আত্মবিকাশের সুযোগ পায় নাই।

১৯৪৭ সালের মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের সমর্থন হিন্দু আধিপত্যবাদেরই করুণ পরিণতি। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থকেন্দ্রিক নীতি-পদক্ষেপ প্রধানত সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বিশ শতকের রাজনৈতিক ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখবো– সে সময়ের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হলো– ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ধারার সংগঠনের বিকাশ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অবনতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পরিশেষে ভারত বিভাগ ও ইংরেজ শাসনের অবসান।

এ প্রসঙ্গে এই উপমহাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের (তৎকালীন) কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলেই নয়। বিশেষত ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের আলোচনা আবশ্যক। স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব না হলেও তার কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

যদিও বাংলাদেশে মুসলিম রাজনীতির গোড়াপত্তন হয় ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ দশকটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম রাজনৈতিক গণজাগরণের কাল।

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভক্তির প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা এবং আসামের জন্য একটি, পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরেকটি মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পূর্ববাংলা এবং আসামের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাতে পনের জনের মধ্যে সভাপতি ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং ময়মনসিংহের খান বাহাদুর (পরে নবাব উপাধি পেয়েছিলেন) সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীসহ বারোজনই ছিলেন অভিজাত জমিদার শ্রেণির। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন অবাঙালি বংশোদ্ভূত।

প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম জনসাধারণের সাথে এই সকল নেতাদের আত্মিক বন্ধন ছিল না, তারা তাদেরকে (মুসলিম জনসাধারণকে) কেবল জমিদার প্রজা বা একই ধর্মের অনুসারী বলে ভাবত।

প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ধারা অভিজাত শ্রেণির পকেটবন্দি থাকে, এরা সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের 'বাঙালি' বলে স্বীকৃতি দিত না– বাঙালি বলতে তারা 'হিন্দু বাঙালি' মনে করতেন। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লীগও মুসলিম জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন সেই নবাব, জমিদার এবং উচ্চ বিত্তবান শ্রেণি, যারা ছিলেন কলিকাতায় বহিরাগত। তখনকার মুসলিম লীগ পলিটিক্সকে বলা হতো জেনটেলম্যান পলিটিক্স। তাঁদের রাজনীতি ব্রিটিশ শাসক সমীপে আবেদন-নিবেদন এবং প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১১ সালে নাইট, নবাব উপাধি দিয়েই তাদেরকে বঙ্গ বিভক্তি রদ মানিয়ে নেয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে স্বাধীন প্রতিবাদী রাজনীতির সূচনা ঘটালেন তৎকালীন ইয়াং মুসলিম গ্রুপ– এদের মধ্যে দুই ব্যক্তি হচ্ছেন বাংলার সংগ্রামী সন্তান বিশিষ্ট আইনজীবী আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং মেদিনিপুরের বিশিষ্ট শিক্ষিত পেশাজীবী পরিবারের অক্সফোর্ড থেকে আইনে বিসিএল ডিগ্রি নেয়া হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে তরুণ রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর আবির্ভাব রচিত হয় চরম এক বৈরী সময়ে। তিনি শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে ভারতের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল-কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসার লাভ করে, পাঁচ দশকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সক্রিয় কিছু হিন্দু নেতৃত্ব গুণে। এদের মধ্যে ছিলেন দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বদরুদ্দীন অয়েরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদন মোহন মালব্য, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ।

১৯১৭ সালে আফ্রিকা থেকে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি এসে ১৯২০ সালে কংগ্রেসে ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

এদিকে জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সূচিত হয় খেলাফত আন্দোলন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎ চলতে থাকে। এ আন্দোলন ছিল অবিভক্ত ভারতের প্রথম ও শেষ হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনের ফলাফল ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তোলে। এ নির্বাচনে ৮০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১১টি আসন পায়। তবে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ২৬টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ সর্বত্রই মন্ত্রিসভায় নিজ অন্তর্ভুক্তির দাবি জানায়। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু মুসলিম লীগের এ দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলে জিন্নাহ তাতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি তার পূর্বতন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিপরীতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ জাতীয় রাজনীতির ধারায় প্রধান দু'টি ধর্ম সম্প্রদায়-হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্রমশ বিনষ্ট হতে থাকে।

এবারে আসি ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রসঙ্গে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে তরুণ শেখ মুজিবের শৈশব অতিক্রান্ত । তিনি তখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। বিশ্ব পরিসরে তখন চলছে আধুনিক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সজ্জিত দু'টি শিবিরে বিভক্ত, দু'টি বিশ্ব শক্তির মধ্যে আধিপত্যের লড়াই। বিশ্বের শুভকামী মানুষের মনে সৃষ্টি হয় নানা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা। উপমহাদেশের রাজনীতিতে নানা টানাপোড়েন আর স্বার্থের সংঘাত; এ সময় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০-এর এ প্রস্তাবে একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। তাই বিজ্ঞ মহলকে বলতে শোনা যায়। "লাহোর প্রস্তাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।"

২৩শে মার্চ তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এই অধিবেশনে প্রস্তাবটি (লাহোর প্রস্তাব) উত্থাপন করেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন যুক্ত প্রদেশের চৌধুরী খালেকুজ্জামান। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

"Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country of acceptable to muslim unless it is designed on the following basic principles, viz, that geographically contigaous units are demarcated into regions which should be grouped to constitute "**Independent states**" in which constituent units shall be autonomous and sovereign."

66

প্রাচীন যুগ বা মধ্য যুগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। প্রাচীন বাঙলা নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা 'হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালি' কথাটা উচ্চারণ করি এবং এ নিয়ে গৌরব বোধ করি। যুগ যুগ ধরে এসব জনপদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত একটা ঐক্যসূত্র ছিল। সেই ঐক্যবোধ আজো আমরা লালন করে আসছি আমাদের চৈতন্যের গভীরে

99

লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত। উক্ত অধিবেশনে আরো দাবি করা হয় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং ভারত শাসন আইন পুনঃবিবেচিত না হলে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মতি ছাড়া প্রণীত অপর কোনো পরিকল্পনা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের প্রস্তাবটিতে একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি এবং পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ নিয়ে অপরটি (যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ)। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা হিসেবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। বাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেস সমর্থিত ফেডারেশন গঠনের যে ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার বিপক্ষে তাঁদের মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে লাহোর প্রস্তাবের মূল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পরপরই ১৯৪৬ সালের ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত মুসলিম সদস্যবৃন্দের এক কনভেনশন আহবান করেন। উদ্দেশ্য, কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মুসলিম কোটা মনোনয়নে মুসলিম লীগের অধিকার প্রতিষ্ঠা। সর্বমোট ৪৮০ জন আইন পরিষদ সদস্যের মধ্যে

৪৫০ জন উক্ত কনভেনশনে যোগদান করেছিলেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪৬-এর ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত মুসলিম পরিষদ সদস্যদের এ কনভেনশন যদিও আহবান করা হয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম কোটা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে; কিন্তু তার পরিবর্তে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের মূল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন।

১৯৪০-এর প্রস্তাবে একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, জিন্নাহর বরাত দিয়ে 'স্টেটস' (States) শব্দের পরিবর্তে 'স্টেট' (State) শব্দ বসিয়ে দেন। প্রিন্টিং মিসটেক বলে যুক্তি দাঁড় করান। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে সংশোধন করানো হয় অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে। লাহোর প্রস্তাবের 'একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র' 'দিল্লী কনভেনশনে' 'এক মুসলিম রাষ্ট্র' পরিণত হয়।

এই পরিবর্তন কার্যক্রম ঘটার সময় কনভেনশনে উপস্থিত বাংলার মুসলিম পরিষদ সদস্যবৃন্দের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন আসাম প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম– তাঁরা প্রতিবাদী কণ্ঠে প্রশ্ন তোলেন, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম প্রতিনিধিত্বে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কোনো সিদ্ধান্ত পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন রাখে কি না? কিন্তু জিন্নাহ সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে এক পাকিস্তানের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পনেরশ' মাইলের ব্যবধান এবং মানচিত্রের অসংলগ্নতা, ভাষা সংস্কৃতিগত পার্থক্য ও জীবনযাত্রার মৌলিক ব্যবধান ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে একমাত্র বন্ধনসূত্র ধর্মকে সম্বল করে এক কৃত্রিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা নেন।

পাকিস্তান আন্দোলনকে ঘিরে শেখ মুজিব বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাই তিনি বলেছিলেন, "১৯৪৭ সালের পূর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা স্বাধীন হবো।"

১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং একই সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে আহবান করা হয় যে, ভারতের মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের একমাত্র সংগঠন মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ এবং যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন।

এ দিবসটি নিয়ে দুই ধরনের বক্তব্যের উদ্রেক হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগস্ট কলকাতায় এক ছাত্রসমাবেশে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন 'লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সে সময় পাকিস্তান ছিল সময়ের দাবি। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শেখ মুজিব জিন্নাহর দ্বিজাতি-তত্ত্বকে অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে নয়, ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি কৌশলগত কাঠামোই মনে করতেন।

১৫ আগস্ট ১৯৪৬ সাল শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে মুসলিম লীগ হাই কমান্ড ও হিন্দু মহাসভা 'হিন্দু বিরোধী' সাম্প্রদায়িক রূপ দিলেও আবুল হাশিম ও তার অনুসারীরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনরূপেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে অংশ নেন।

শেখ মুজিব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে ২০টি ট্রাকে কয়েকটি মাইকসহ বেকার হোস্টেল থেকে ট্রাক মিছিলে নেতৃত্ব দেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মিছিলটি ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশবিরোধী।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে ১৬ থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত কলকাতায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যা ছিল মূলত লীগকে এড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাবকে উস্কে দেয়া।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক-বাহক। ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যদিয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল তা প্রকৃত স্বাধীনতা কিনা তা নিয়ে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। শৈশব-কৈশোরে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে, কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী সহযোগিতা করলেও তারা জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক মানসিকতার সমর্থন দেয়নি। মুজিবের কাছে সদ্য ব্রিটিশ ও জমিদার আধিপত্যের পর সাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড পাকিস্তান ছিল 'এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে পড়া।'

তিনি মুসলিম লীগের পশ্চিমা প্রাধান্য আর বুর্জোয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের অল্পকাল পর থেকে বাঙালি মুসলিম মানসে যে পরিবর্তনের সূচনা তা ছিল সাম্প্রদায়িক ভাবধারার পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

১৯৪৭-এর আগস্টে বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ-এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় আসেন। তিনি ও তাঁর সমমনা শামসুল হক, তাজুদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দিন আহাম্মদ, মোহাম্মাদ তোয়াহা, নুরুদ্দিন আহম্মদ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামীয়' সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাষার ও কৃষ্টির ওপর সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের উদ্দেশ্যেই এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়।

শৈশব-কৈশোরে মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। তবে ১৯৪৭ সাল বাঙালির সত্যিকার স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকেই তার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু। মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোভাব ও পশ্চিমা প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালের অল্পকাল পর থেকে বাঙালি মুসলিম মানসে যে পরিবর্তন ধারার সূচনা হলো তা হলো পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক মনোভাবে জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বদরুদ্দীন উমরের বর্ণনায়, মুসলমানদের (বাঙালি) এই মানসিকতা পরিবর্তন শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রথম 'বাঙালি মুসলমান' 'মুসলমান বাঙালিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো।" বদরুদ্দীন একে 'বিপ্লব' এবং মুসলিম বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নামে অভিহিত করেন। এই মানসিক বিপ্লব ঘটেছিল ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মুসলিম বাঙালিদের মধ্যেই। অভূতপূর্ব এই দেশপ্রেমের তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এই ভূখণ্ডেই ঘটেছিল।

ভাষা আন্দোলন ছিল একান্তভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের মাতৃভাষার আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও উত্থান। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়েই বাঙালি জাতি সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয় যার পরিণতি আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সংস্কৃতি ভিত্তিক বাঙালিত্ববোধ, বাঙালি ঐক্য ও চেতনা উদ্বুদ্ধ করে দুই দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের এ উত্থানকে।

ইতিহাসের এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ সর্বভারতীয় জাতিতত্ত্ব ও পরবর্তীকালে দ্বিজাতি-তত্ত্বকে খণ্ডন করে।

ইতিহাসের মহানায়ক 'শেখ মুজিবুর রহমান ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত' একক সত্তা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বঙ্গবন্ধুকে ১৯৪৭-'৫২ সাল পর্যন্ত কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে ধর্মঘট চালিয়ে যান। তিনি ১৯৪৭ সালে যুব লীগ-এর ব্যানারে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভাষা আন্দোলনের আবহ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেন। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষার দাবিতে অনশন করায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠি তাঁকে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত করে। এ সময় নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে শাসুদ্দোহাসহ আরো কিছু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুজিবের দেখা হয়। তারা জানতেন এই পথেই বঙ্গবন্ধুকে স্থানান্তরের জন্যে নেয়া হবে। সেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে একুশের হরতালের জোর আহ্বানে ভাষণও দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জেলখানার বাইরে অবস্থান মানেই ছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড়, তাই কৌশলী পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাকে কারাগারে অন্তরীণ রাখত। কিন্তু জেলখানায় বসেই তিনি ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে অনশন করেন। ২১-এর এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পশ্চিমা শাসকশ্রেণির ভিত নড়ে ওঠে। জনগণের দাবির মুখে ওরা মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভাষা আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের ত্যাগ ও চেতনা সমুন্নত রেখে বাঙালির অধিকার অর্জনে সক্রিয় নেতৃত্ব দেন তিনি।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক দলে রূপান্তরিত হয়। আর আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই সুদীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ, যার দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

শুধু তাই নয়, জাতির জনক পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

তাঁর ভাষ্য ছিল, 'আমাদের নামে অপপ্রচার চালানো হয়– আমরা নাকি ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, লেবেলসর্বস্ব

ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে।'

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। সে বিতর্কে না গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুজিব দর্শন নিয়ে কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করা হলো। এ প্রসঙ্গে কবি নজরুলের কটি পঙক্তির উদ্ধৃতি টানা যেতে পারে-

'অসহায় জাতি, মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ'!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর, মার।'

ধর্মনিরপেক্ষতা কবি নজরুলের এই মর্মবাণীই তুলে ধরে। আর শেখ মুজিব ছিলেন কবির কল্পনার সেই কাণ্ডারী।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শিক প্রত্যয় হলো ইহজাগতিকতা। এই প্রত্যয় মহান স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সে বিশ্বাস কোনো স্বার্থ হাসিলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক'জন ব্যক্তিকে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আনা যেতে পারে। প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা বলবো, যার দার্শনিক বিশ্বাস ছিল 'ভাববাদ'।

তার অসংখ্য গানে, কবিতায়, রচনায়, তিনি তার ভাববাদী দর্শনের প্রমাণ রেখে গেছেন। কিন্তু, তাঁর অসংখ্য রচনায় তিনি যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ রেখে গেছেন- যেমন 'বাঙালির মন বাঙালির প্রাণ, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হোক, এক হোক এক হোক, হে ভগবান।'

আমার 'সবার পরশে পবিত্র কর তীর্থ নীরে'। শুধু তাঁর রচনায়ই নয়, তার বক্তৃতায়, কাজে তিনি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেছেন, তিনি অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণা করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মুসলিম, তিনি অসংখ্য ধর্মীয় সংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর অসংখ্য রচনায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যবাদিতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।/

'হায়রে ভজনালয়'
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষের ঘৃণা করি।
ও কারা কোরান, বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষের মেরে।/

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান, নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

'বাঙালির জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, 'অপর কোনো বড় বাঙালি কবি যা করেননি, নজরুল তাই করেছিলেন সাহিত্যে, হিন্দু পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্যকে এক করে দিয়েছিলেন। এই ঐক্যের ব্যাপারটা সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যে যেমন ঘটেছে, সাহিত্যে তেমন ঘটেনি। সাহিত্য বড়ই স্পর্শকাতর। সেইজন্য নজরুলের কাজটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ ও ঈশ্বরবাদী কয়জন ব্যক্তি হলো- ফ্রান্সিস বেকন, রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষ বোস।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে প্রয়োজন তা সম্ভব মনে করতেন। খাদ্যকে তিনি বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। তার উক্তি 'পৃথিবীতে শূদ্রের আসন অত্যাসন্ন।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা' এর প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিষ্টান হউক, বাঙালি বাঙালিই।'

নেতাজী সুভাষ বসু ইতিহাসের বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার আজাদ হিন্দ ফৌজ সাম্প্রদায়িক ছিল না।

১৮৫৭-এর সিপাহী অভ্যুত্থান একটি ক্রান্তিলগ্ন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমনি, মধ্যবিত্ত বাঙালির সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি। বর্ণবাদী ইংরেজ সেনাদের হাতে নিগৃহীত হয়ে এবং বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে বৈষম্য লক্ষ্য করে তারা অভ্যুত্থান ঘটায়। এ আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্বকে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কবি ও সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) 'সংবাদ প্রভাকরের' ১৮৫৭তম সংখ্যায় এই অভ্যুত্থানকে তিনি 'অধর্মাচার' বলে অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রের সমস্যাগুলোর সমাধান সবসময়েই ধর্মনিরপেক্ষ, একে ধর্মের পোশাক যে পরানো হয়, সেটা নিতান্তই প্রতারণামূলক। এ কাজ অতীতে করা হয়েছে, এখনো করা হচ্ছে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ধর্মীয় নয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই বেশি পছন্দ। শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ না করলে মৌলবাদের সুবিধা হতে থাকবে, এখন যেমন হচ্ছে।

গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন ও সামাজিক বিপ্লবের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য অপ্রত্যক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাই 'উর্দু, কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সে ঘোষণা মধ্যবিত্তকে ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। কারণ, তা একাধারে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ছিল পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। এরকমের রাজনৈতিক আন্দোলন কলিকাতায় হয়েছে সাতচল্লিশের ঠিক আগে- ইতিহাসে তা তেভাগা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তাই। বাংলাভাষার হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্রের যে বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে বিরোধের সৃষ্টি করত বায়ান্ন সালে সে বিরোধ আর সত্য ছিল না। এ আন্দোলনের পথ ধরে এগিয়েই বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, ধর্ম নয়, আধিপত্যবাদ বা বৈষম্যবাদই আসল সমস্যা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটেছে ১৯৪৮-এ। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে, এই মুসলিম শব্দটি নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তোলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে তখন মুসলিম শব্দটা যোগ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানরা এক সময় নিগৃহীত ছিল বলেই উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। তবে সে জাতীয়তাবাদ ছিল প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পথে পা ফেলা, কারণ উপমহাদেশে তখন ইংরেজ শাসন ও হিন্দু আধিপত্যবাদ বাঙালি মুসলিমদের নিগৃহীত করে। তবে ইংরেজ উৎখাতের লক্ষ্যে যে সময়ে মুসলিম স্বজাতিবোধ প্রথমে পাকিস্তান ও পরে আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়, তখন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে ওঠে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ (৫৫ সালে)। এর পরে আওয়ামী লীগ পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ একটি দলে পরিণত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান হয় ১৯৪২ সাল থেকে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের অনুসারী ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে ধর্মীয় প্রভাব পড়ে তা ছিল ইংরেজ আধিপত্যের ফল।

৫২-র আন্দোলনে অগ্রণী নেতৃত্বের ভূমিকার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন শেখ মুজিব। ৫২-র অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ হয় ১৯৪৮ সাল থেকেই। সে সময় থেকেই জেল-জুলুম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন 'বঙ্গবন্ধু'। তাঁর রাজনীতির শক্ত ভিত গড়ে ওঠে ৫২-র অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। তাই বলা যায়, তাঁর রাজনৈতিক উত্থান হয় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাচেতনার নিরিখে।

তাইতো তিনি পরবর্তীতে তাঁর রাজনীতির মূল দর্শনে সুনিষ্টিভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন আজকের বাংলাদেশে বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে, বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী।' তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি, তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।'

এভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ধর্ম-নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী একজন নেতা।

লেখক: সাংবাদিক, বাসস

বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মরণীয় উক্তি

বরেণ্য ব্যক্তিদের অনেক উক্তি মানব কল্যাণের বাণী হয়ে ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সত্যি এমন একজন বরেণ্য ব্যক্তি। দেশপ্রেমী এই মানুষটির অনেক উক্তি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে নাড়া দেয়। কেননা তাঁর সেসব উক্তি দেশপ্রেমে পূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু একবার একান্ত আলাপচারিতায় যুবলীগের কয়েকজন কর্মীকে বলেছিলেন, আমি মারা গেলে আমার কবরে একটা টিনের চোঙ্গা রেখে দিস। লোকে জানবে, এই একটা লোক একটা টিনের চোঙ্গা হাতে নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল এবং সারাজীবন সেই টিনের চোঙ্গায় 'বাঙালি', 'বাঙালি' বলে চিৎকার করতে করতেই মারা গেল।

বঙ্গবন্ধুর এমন আরও কিছু হৃদয়স্পর্শী উক্তি নিম্নরূপ:-

* আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ।

* এদেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। (১০ জানুয়ারি ১৯৭২)
* এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেটভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন, তখনই শুধু লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে। (১৬ জানুয়ারি ১৯৭২)
* সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না। (২১ জানুয়ারি ১৯৭২)
* বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। (৯ মে ১৯৭২)
* দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩)
* রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিস, তা হচ্ছে নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।
* বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। (১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন)
* আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে 'বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা ছেড়ে দাও', বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য। (২৬ মার্চ ১৯৭৫)
* যে মানুষ মৃত্যুর জন্য তৈরি তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে না। (ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকার)
* আমার বিশ্বাস ছিল যে, মাথা উঁচু করে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি তাহলে আমার দেশবাসীর লজ্জার কিছুই থাকবে না। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আমি যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমার দেশবাসী সারাবিশ্বে আর মুখ দেখাতে পারবে না। জনগণের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া শ্রেয়। (ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকার)
* শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামীদিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব। (বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ ১৯৭২-এর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ থেকে)
* ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেইজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। (জাতীয় সংসদ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫)
* বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি। (সংবর্ধনাসভা, মৌলভীবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)
* আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।
* আজ জনসাধারণ যুবসমাজের কাছ থেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব আশা করে। দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য দেশগড়ার কাজে সুশৃঙ্খল যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমি আশা করি, আওয়ামী যুবলীগ কর্মীরা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। (বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস ১৯৭৪ উপলক্ষে বাণী।)
* একটা বড় কথা বলিতে চাই, এদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অবশ্যই কায়েম করা হইবে। বড় লোককে আর বড়লোক হইতে দেওয়া হইবে না এবং গরিবকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না। এই দেশ হইবে গরিব শ্রমিক-কৃষক সর্বহারা মেহনতি মানুষের। (রেসকোর্সের বিশাল সমাবেশে)। সূত্র: আজাদ, সোমবার, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১।
* জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি বামপন্থীও নই, কিংবা দক্ষিণপন্থীও নই, আমি আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে।
* জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমি জেল খাটিয়াছি, জুলুম সহ্য করিয়াছি, ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা বুকের রক্ত দিয়ে আমাকে আবার তাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছে। দেশবাসীর যে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি উহার চাইতে বড় কিছুই আমার পাওয়ার নাই। দেশবাসীর রক্তের ঋণ আমি শোধ করিবই।
* ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম। আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।
* সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। (জুন ১৯৭৫)
* এ প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়। আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না।
* মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।
* আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট ব্রিটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। (মার্চ ১৯৭৩)

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান:এই দেশ এই মাটি, আগামী প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১০৪, ১১৮, ১৫৫, ১৬৪
২. শেখ মুজিবুর রহমান: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৩
৩. আতিউর রহমান, বঙ্গবন্ধু সহজ পাঠ, পৃ. ৪২
৪. ফরিদা ইয়াসমীন, ইতিহাসের আয়নায় বঙ্গবন্ধু
৫. রাহাত মিনহাজ, সায়মন ড্রিং ও অন্যান্যের একাত্তর; শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৭।

গ্রন্থনা: নুরুন্নাহার নুরু, প্রতিবেদক, পিআইবি